পঞ্চম জাতীয় সংসদের ভূমিকা ও কার্যকারিতা (১৯৯১-১৯৯৬) প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূইয়া
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষক
মোঃ গুলজার আহমেদ
এম ফিল গবেষক
রেজিঃ নং- ১৪২
শিক্ষাবর্ষ- ২০০১-২০০২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য এই অভিসন্দর্ভটি দাখিল করা হল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RB
B
328.1
AHP
c.1

404207

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

GIFT

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ভূমিকা ও কার্যকারিতা (১৯৯১-১৯৯৬) প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

Dhaka University Library
404207

404207

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

(আমার শ্রদ্ধেয় মরহুম মা ও বাবাকে)

404207

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

মোঃ সুলতান আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "পঞ্চম জাতীয় সংসদের ভূমিকা ও কার্যকারিতা (১৯৯১-১৯৯৬) প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ কোনো ডিগ্রী অথবা প্রকাশনার জন্য ইতোপূর্বে কোথাও দাখিল করা হয়নি। এটি এখন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার জন্য অনুমোদন করছি।

তারিখ ঃ 30.11.2006
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

404207

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "পঞ্চম জাতীয় সংসদের ভূমিকা ও কার্যকারিতা (১৯৯১-১৯৯৬) প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

৩০.১১.২০০৬
ঢাকা

(মো: সুলতান আহমদ)
মোঃ সুলতান আহমদ
এম.ফিল গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

থিসিসটি সম্পন্ন করতে যিনি সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তিনি হচ্ছেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া। অধ্যাপক ড. এ.এইচ.এম. আমিনুর রহমান, অধ্যাপক এম. সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. এম. নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোঃ নুরুল আমিন বেপারী, অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন আমাকে এই কাজে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। শ্রদ্ধেয় বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় শিক্ষকমন্ডলী বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

যাদের সহযোগিতায় ও অনুপ্রেরণায় আমার থিসিসের কাজ সম্পন্ন হয়েছে তাদের সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোঃ সুলতান আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় পরিকল্পনা

Chapter Scheme

প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পটি পাঁচটি স্বতন্ত্র কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়টি-এ গবেষণা প্রকল্পটির ভিত্তি নির্মাণ করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক কাঠামো, কার্যপদ্ধতি, ক্ষমতা, কার্যাবলী ও মর্যাদা আলোচনা করা হয়েছে এবং তা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম পার্লামেন্ট হতে পঞ্চম পার্লামেন্ট পর্যন্ত উপযুক্ত, বৈশিষ্ট্য-গুলোর পরিবর্তিত ধারা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের মানসিকতা কেমন ছিলো তার একটি আপেক্ষিক ধারণা পাওয়া যাবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সাংসদদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক পরিমন্ডল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এঁরা যে শুধু সংসদের প্রতিনিধিত্ব করবেন তা নয়, আপন ব্যক্তি মানসের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটিও স্মতর্ব। পরিবেশ বয়স শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক মতাদর্শ ইত্যাদি সব মিলিয়ে যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ তারও প্রতিফলন হয় তাঁদের ভূমিকায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চম পার্লামেন্টের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কারন কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে তা মূল্যায়নের জন্য এর কার্যকলাপকে কতগুলো মাপকাঠিতে বিশ্লেষনের প্রয়োজন।

পঞ্চম অধ্যায়ে সংসদীয় গণতন্ত্র ও কার্যক্রমের মূল্যায়নের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে বাংগালী জনগণের বহু দিনের আশার প্রতিফলন, পঞ্চম সংসদ কতটুকু গণতান্ত্রিক কিংবা অগণতান্ত্রিক ছিলো তার বাস্তব প্রতিফলন।

সর্বশেষ পঞ্চম জাতীয় সংসদের উপসংহার তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

সারণী নং			পৃষ্ঠা নং
৩.১	ঃ	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদ	৪২
৩.২	ঃ	১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮ ও ১৯৯১ এর নির্বাচনে অংশগ্রহনকৃত ভোটার প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের তুলনামূলক চিত্র	৪৪
৩.৩	ঃ	১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল : দলীয় অবস্থান (বিজয়ী আসনের)	৪৫
৩.৪	ঃ	প্রথম (১৯৭৩) ও পঞ্চম (১৯৯১) সংসদে নির্বাচিত সাংসদদের বয়সের তুলনামুলক চিত্র	৪৮
৩.৫	ঃ	প্রথম ('৭৩) ও পঞ্চম ('৯১) সংসদে নির্বাচিত সাংসদদের শিক্ষাগত মানের তুলনামূলক চিত্র	৪৯
৩.৬	ঃ	১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের পেশাগত অবস্থান	৫১
৩.৭	ঃ	১৯৭৩ এবং ১৯৯১-এ আইনসভায় নির্বাচিত সাংসদদের তুলনামূলক পেশাগত অবস্থান	৫৩
৩.৮	ঃ	পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা	৫৫
৩.৯	ঃ	প্রথম ও পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের সংসদীয় অভিজ্ঞতার অবস্থান	৫৬
৩.১০	ঃ	পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের রাজনৈতিক অতীত	৫৮
৪.১	ঃ	পঞ্চম সংসদ অধিবেশন সমূহের শুরু শেষ ও মোট কার্যদিবস	৬৩
৪.২	ঃ	পঞ্চম সংসদে উত্থাপিত ও গৃহীত সরকারী সাধারণ বিলের অধিবেশন ওয়ারী সংখ্যা	৭৪
৪.৩	ঃ	পঞ্চম সংসদের কমিটি সমূহের নাম ও সংখ্যা	৭৬
৪.৪	ঃ	জাতীয় সংসদের ষ্ট্যান্ডিং কমিটির বিভিন্ন ভাগ	৭৭
৪.৫	ঃ	পঞ্চম সংসদে কমিটি গুলোর পেশকৃত রিপোর্টের বিবরণ	৭৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং			পৃষ্ঠা নং
৪.৬	ঃ	৪১ টি মিল নিয়ে গঠিত সংস্থার লাভ ক্ষতির হিসাব	৮৬
৫.১	ঃ	কমিটি সমূহের রিপোর্ট এবং সুপারিশ কদাচিৎ বাস্তবায়নে সরকারের স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতার উপর মতামত	১০৭
৫.২	ঃ	পঞ্চম সংসদে প্রায় এক তৃতীয়াংশ অধ্যাদেশ সংক্রান্ত আইন পাশ কি গণতান্ত্রিক? এর উপর মতামত	১০৮
৫.৩	ঃ	পঞ্চম সংসদে উপনির্বাচনগুলো অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন সংক্রান্ত মতামত	১১২
৫.৪	ঃ	পঞ্চম সংসদ থেকে বিরোধী দলগুলোর পদত্যাগই ছিলো একমাত্র পথ এর উপর মতামত	১১৩
৫.৫	ঃ	বিরোধী দলের আসন শূন্য হওয়ার পর সরকারী দলের সংসদ ভেঙ্গে দেয়া সম্পর্কে মতামত	১১৪
৫.৬	ঃ	ষষ্ঠ পার্লামেন্ট নির্বাচন কি অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিলো? এর উপর মতামত	১১৬
৫.৭	ঃ	বিরোধী দলগুলোর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কি গণতান্ত্রিক? এর উপর মতামত	১১৭
৫.৮	ঃ	বিরোধী দলগুলো কেবলমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করে এর উপর মতামত	১১৯
৫.৯	ঃ	পঞ্চম পার্লামেন্টের কার্যপ্রনালী সংসদীয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন সংক্রান্ত মতামত	১২১

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা নং
		প্রত্যয়নপত্র	I
		ঘোষণাপত্র	II
		কৃতজ্ঞতা স্বীকার	III
		অধ্যায় পরিকল্পনা	IV
		সারণী তালিকা	V-VI
অধ্যায়	১	ভূমিকা, গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি	৩-১৪
	১.১	ভূমিকা	৩-৮
	১.২	বাংলাদেশের আইনসভা ঃ একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৮-১০
	১.৩	গবেষণার উদ্দেশ্য	১১-১৩
	১.৪	গবেষণা পদ্ধতি	১৪
অধ্যায়	২	জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক কাঠামো, কার্যপদ্ধতি, ক্ষমতা, কার্যাবলী ও মর্যাদা	১৬-৩৫
অধ্যায়	৩	জাতীয় সংসদ ও সাংসদদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি	৩৬-৬১
অধ্যায়	৪	পঞ্চম সংসদের কার্যকারিতা (১৯৯১-১৯৯৬)	৬২-১০০
	৪.১	অধিবেশন সমূহের আলোচনা	৬২-৭৪
	৪.২	কমিটি ব্যবস্থা ও কার্যক্রম	৭৫-৮১
	৪.৩	কৃষি ব্যবস্থা	৮১-৮৩
	৪.৪	শিল্প ব্যবস্থা	৮৩-৮৭

Dhaka University Institutional Repository

			পৃষ্ঠা নং
	৪.৫	দারিদ্র দূরীকরণ	৮৭-৯১
	৪.৬	শিক্ষা ব্যবস্থা	৯১-৯২
	৪.৭	তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ এবং আন্দোলনের গতিধারা ও প্রকৃতি	৯৩-১০০
অধ্যায়	৫	সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যক্রমের মূল্যায়ন (১৯৯১-১৯৯৬) ও জরীপের ফলাফল বিশ্লেষণ।	১০৪-১২৫
		উপসংহার	১২৬-১২৭
পরিশিষ্ট	১	দ্বাদশ সংশোধনীর পূর্ণ বিবরণ	১২৮-১৩৯
পরিশিষ্ট	২	ত্রয়োদশ সংশোধনীর পূর্ণ বিবরণ	১৪০-১৪৩
		সাক্ষাৎকারের তালিকা	১৪৪-১৫৬
		জরিপের প্রশ্নমালা	১৫৭-১৫৯
		গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যপঞ্জী	১৬০-১৭১

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- ১

ভূমিকা, গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

১.১ ভূমিকা
Introduction

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কারন আইন পরিষদ আইন প্রনয়ন না করলে অন্য দুটি বিভাগ স্বাভাবিকভাবে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনকে শাসন বিভাগ কার্যকর করে এবং বিচার বিভাগ আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে।[১] বিশ্বের প্রায় সব দেশেই আইনসভা রয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জনগনের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থা হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং সরকারের তহবিল নিয়ন্ত্রন এবং সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে থাকে। এমনকি একনায়কতান্ত্রিক কিংবা একদলীয় শাসন ব্যবস্থাতেও আইনসভা তাত্ত্বিকভাবে জনগনের প্রতিনিধি হিসেবে সর্বোচ্চ সংস্থা বলে আখ্যায়িত।

বর্তমানে বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রে সুপ্রীম সোভিয়েত ছিলো "রাষ্ট্র ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা"। সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীম সোভিয়েতকে আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, গনভোটে বিল পাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা, অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত ক্ষমতা, নতুন প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি করা, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদকে তাদের সম্পর্কিত কার্যাবলীর জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে হতো। সর্বোপরি, সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত সভাপতি মন্ডলী বা প্রেসিডিয়ামরাও আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল ছিলেন। সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনসভার সর্বোচ্চ মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও একদলীয় শাসনব্যবস্থাও প্রেসিডিয়ামদের কারণে সে দেশে আইনসভা কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। জুলিয়ান টাউস্টারের মতে, তত্ত্বগতভাবে সুপ্রীম সোভিয়েত সর্বোচ্চ আইন প্রনয়নকারী সংস্থা হলেও বাস্তবে তা প্রধানত: অনুমোদনকারী সংস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।[২] পৃথিবীর অন্যান্য একদলীয় শাসন ব্যবস্থাতেও আইনসভা একটি অক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসাবেই পরিচিত। বাংলাদেশে একদলীয় শাসনামলও অনুরূপ ছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, একনায়কতান্ত্রিক কিংবা একদলীয় শাসন ব্যবস্থাতে আইনসভার তেমন ভূমিকা না থাকলেও বস্তুত: সকল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনসভাকে এমন একটি বিভাগ বলে মনে করা হয় যা নির্বাচকমন্ডলীর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি।

আইনসভার কার্যাবলী

Functions of the Legislature

আইনসভার কাজ সম্পর্কে কোন সর্বজন স্বীকৃত সুনির্দিষ্ট তালিকা নেই। গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সরকার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন রকম হওয়ার কারনে আইনসভার কাজ ও ক্ষমতায় তারতম্য হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি (Presidential System) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে শাসন বিভাগ ও আইনসভা সম-মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের শাসন বিভাগ আইন সভার নিকট দায়ী। তবে সবকার পদ্ধতি যে ধরনেরই হোক না কেন বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা কতগুলো অভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে।

ডব্লিউ, এফ, উইলোবি (W.F. Willoughby) সাধারনভাবে আইনসভার কাজগুলোকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেনীতে ভাগ করে আলোচনা করেছেন: আইন প্রনয়ন, বাজেট অনুমোদন, সংবিধান সংশোধন, নির্বাচন জনমত গঠন, অনুসন্ধান এবং শাসন সংক্রান্ত।[৩] ফ্রেড আর, হ্যারিস (Fred R. Harris) মার্কিন কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর আলোকে আইনসভার কাজকে দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা: আইন প্রনয়ন, শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রন, রাজনৈতিক শিক্ষাদান, প্রতিনিধিত্বকরণ, তহবিল নিয়ন্ত্রন, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ, অভিশংসন, অনুসন্ধান পরিচালনা, সংবিধান সংশোধন এবং নির্বাচন।[৪] সত্যসাধন চক্রবর্তী এবং নিমাই প্রামানিক তাঁদের গ্রন্থে কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে প্রধানত: সাতটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন, যথা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত ক্ষমতা, নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা, শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা, নির্দেশমূলক ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং তদন্ত করার ক্ষমতা।[৫] মাইকেল স্টুয়ার্ট (Michael Stewart) এর মতে বৃটিশ পার্লামেন্ট প্রধানত চারটি কাজ সম্পাদন করে থাকে। এগুলো হচ্ছে আইন প্রণয়ন শাসন বিভাগের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও সমালোচনা করা, বিতর্ক অনুষ্ঠান করা এবং আর্থিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রন করা।[৬] সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামানিকের মতে কমন্সসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে সাধারণভাবে ছয়শ্রেনীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা

Dhaka University Institutional Repository

যেতে পারে, যথা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা, সরকার গঠনের ক্ষমতা, সরকারকে নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা, অভিযোগের প্রতিকার করার ক্ষমতা এবং জনমত গঠন সংক্রান্ত কাজ।[৭] ডি, সি গুপ্ত (D. C. Gupta) ভারতের পার্লামেন্টের কার্যাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে আইনসভার কাজকে ছয়টি শ্রেনীতে ভাগ করেছেন। যথা: আইন প্রণয়ন, সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রন, সংবিধান সংশোধন, শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রন, অভিশংসন এবং জনগনের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন।[৮]

উপরোল্লিখিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে বলা যায় যে, আইনসভা সাধারণত: নিম্নে বর্ণিত অভিন্ন কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে।

ক) আইন প্রনয়নমুলক কাজ (Legislative function)

খ) আর্থিক ক্ষমতা (Financial Power)

গ) সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা (Constituent Power)

ঘ) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রন (Control over the executive) ঃ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা নিম্নোক্ত কয়েকটি পদ্ধতির মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রন করে থাকে।

ক) অনাস্থা ও নিন্দাসূচক প্রস্তাব (Vote of no-confidence and Censure)

খ) প্রশ্নোত্তর (Question and answer)

গ) মুলতবী প্রস্তাব (Adjournment motion)

ঘ) মনোযোগ আকর্ষনী প্রস্তাব (Call attention motion)

ঙ) সংক্ষিপ্ত আলোচনা (Discussion for short duration)

চ) সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (Resolution)

রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা সাধারণত: আইনসভায় উপস্থিত থাকতে পারেন না। তাই এখানে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রনের জন্য উপরোল্লিখিত পদ্ধতিগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। তবে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা নিম্নোক্ত উপায়ে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রন আরোপ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ক) তহবিল নিয়ন্ত্রন (Power of the Purse)

খ) নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Electoral Power)

গ) অনুসমর্থন (Ratification)

ঘ) অভিশংসন করার ক্ষমতা (Impeachment)

ঙ) তদন্ত করার ক্ষমতা (Investigation)

অনেক গণতান্ত্রিক দেশে আইনসভা জনমত গঠনেও সহায়তা করে। পার্লামেন্টে যে সব তর্কবিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তার ফলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক তথ্য বের হয়ে আসে। দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোয় আইনসভার কর্মকান্ড সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারলে জনগন শিক্ষিত ও সচেতন হলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সম্বলিত ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করে তারা সঠিক মতামত প্রদান করতে পারে।

সাধারণত: পার্লামেন্ট উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই পার্লামেন্টকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি উপ-ব্যবস্থা (Sul system) হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ সমূহের রাজনীতি অধ্যয়নে সামরিক বাহিনী, স্বার্থগোষ্ঠী (Interest group), আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক দল প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আইনসভা বা পার্লামেন্টের ওপর খুব কম গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। যেসব পন্ডিত ব্যক্তি উন্নয়নশীল দেশের আইনসভা সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের অনেকেই এসব আইনসভাকে শাসনবিভাগের সিদ্ধান্ত অনুমোদনকারী "রাবার ষ্ট্যাম্প" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা প্রভৃতি উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থার আইনসভার ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করে এরূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে শাসন বিভাগ কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আইনসভার ভূমিকা নগন্য হলেও সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এর কোনো গুরুত্ব বা প্রভাব নেই একথা সম্ভবত বলা ঠিক হবে না। পিটার পাইন (Peter Pyne) ইকুয়েডরের কংগ্রেসের কার্যাবলী আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহেও পার্লামেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাঁর মতে উন্নয়নশীল দেশসমূহে পার্লামেন্ট প্রধানত: দুই ধরণের কাজ করে থাকে, যেমন- সিদ্ধান্তমূলক (Decisional) ও বৈধকরণমূলক

Dhaka University Institutional Repository

(Legistimation)[৯] পিটার পাইন আরো বলেন, আইন প্রণয়ন অর্থাৎ বিল উত্থাপন, সংশোধন বা নাকচকরণ এবং শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রন (Administrative Surveillance) সংক্রান্ত কাজগুলো সিদ্ধান্তমূলক কাজের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সাধারণ আইন ও অর্থসংক্রান্ত আইন (বাজেট) প্রণয়নের মাধ্যমে আইনসভা সরকারের সাধারণ নীতি ও আর্থিক ব্যবস্থা নির্ধারণ করে থাকে। তাছাড়া পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন এবং সরকারের নীতি বা কর্মসূচীকে প্রভাবিত করতে পারে।

পার্লামেন্টের বৈধকরণমূলক কাজ বলতে পিটার পাইন বুঝিয়েছেন সরকারের শাসন করার অধিকার প্রতিষ্ঠা বা জোরদার করার ক্ষেত্রে অবদান যোগানো। তিনি বলেন, পার্লামেন্ট একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হিসেবে নিয়মিতভাবে অধিবেশনে মিলিত হয়ে সরকারী কার্যক্রম সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে দেশের চাহিদা অনুসারে আইন প্রনয়ন ও বাজেট পাস করে সরকারকে একটা গণতান্ত্রিক রূপ ও রাজনৈতিক বৈধতা প্রদান করতে পারে। অপরপক্ষে, পার্লামেন্ট যদি সরকারের চাহিদা অনুসারে আইন ও বাজেট প্রণয়নে অসম্মত হয়, কিংবা সরকারের কর্মসূচী বার বার প্রত্যাখান করে। তবে সরকারের বিনষ্ট হতে পারে।[১০] তাছাড়া, একটা উপ-ব্যবস্থা হিসেবে পার্লামেন্টের উপর তার নিজস্ব বৈধতা নির্ভর করে এবং তা গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে। পার্লামেন্টের বৈধতা অনেকাংশ নির্ভর করবে তার সিদ্ধান্তমূলক কাজের সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর।[১১] সেজন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে পার্লামেন্ট সদস্যগণ, বিশেষ করে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ আইন প্রনয়নমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহনের পর্যাপ্ত সুযোগ পাচ্ছেন কিনা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রনের জন্য সংসদীয় পদ্ধতিসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে কিনা এবং সর্বোপরি পার্লামেন্ট সদস্যগন সরকারের নীতি বা কার্যকলাপকে প্রভাবিত করতে পারছেন কিনা এগুলো বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয়।

যদি পার্লামেন্ট কেবল "রাবার ষ্ট্যাম্প" হিসেবে কাজ করে এবং বিরোধী দলসমূহ পার্লামেন্টের মাধ্যমে সরকারের সিদ্ধান্ত বা নীতিসমূহ প্রভাবিত বা সংশোধন করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা পার্লামেন্টের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে এবং দাবী দাওয়া প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে পার্লামেন্টের বাইরে সহিংস আন্দোলনমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হবে, যার ফলে গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে। তাছাড়া দেশে এমন কিছু রাজনৈতিক দল থাকতে পারে যারা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল নয় বরং বিপ্লবের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে তাদের আদর্শ (যেমন সমাজতন্ত্র) প্রতিষ্ঠার জন্য পার্লামেন্টের বাইরে সহিংস কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করে। ফলে সরকারও দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারে। সেক্ষেত্রে শাসকদল ও বিরোধী দলসমূহ পার্লামেন্টকে বিরোধ মীমাংসার ফোরাম হিসেবে ব্যবহার না করে পার্লামেন্টের বাইরে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। ফলে পার্লামেন্ট তার কার্যকারিতা হারায় এবং গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা ক্ষুন্ন হতে পারে।

১.২ বাংলাদেশের আইনসভাঃ একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

Legislative of Bangladesh: A Short Introduction

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের এক বছরের মধ্যে দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রবর্তিত হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সংবিধানেও প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা হিসেবে "জাতীয় সংসদ" নামে একটি আইনসভার ব্যবস্থা রয়েছে, যা "পার্লামেন্ট" নামেও পরিচিত। মওদুদ আহমেদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, সম্প্রতি দুই দশকের জনগনের উচ্চাকাঙ্খা থেকে শিক্ষা নিয়েই বাংলাদেশের সংবিধান পাশ্চাত্য ধারায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতি বাস্তবায়নের বিবেচনা করেছে। আওয়ামীলীগ শুরুতেই একটি "সত্যিকার গনতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করেছিলো যখন তারা সংগ্রাম করেছিলো এবং বহু বছর ত্যাগের এখনই পরিপূর্ণতার সময় কারণ সরকারের ক্ষমতা অবাধ।[১২]

স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনা লগ্নেই জনগন লাভ করে গণতান্ত্রিক সংবিধান। ১৯৭২ এর অন্তবর্তীকালীন সংবিধান আদেশ (Provisional Constitution order 1972) বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রীপরিষদ হলো রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৭২ এর সংবিধানে সে ধারা অব্যাহত থাকে। উক্ত সংবিধানের মূলসুর সংসদীয় গণতন্ত্র। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ এবং জাতীয় সংসদের নিটক দায়ী মন্ত্রিপরিষদ এ সংবিধানের মূল বক্তব্য, মনে হয়েছে, এ জাতির এতোদিনের প্রত্যাশা পূর্ণ হলো। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন টিকেনি।[১৩] ১৯৭৫ এর ২৫ জানুয়ারী চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদকে একটি অধীনস্থ সংস্থায় পরিণত করা হয়। চতুর্থ সংশোধনীর ফলে শুধু শাসন বিভাগের ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রন ক্ষুন্ন হয়নি, রাষ্ট্রপতির হাতে ভেটো ক্ষমতা দেয়ার ফলে এর আইন প্রণয়ন ক্ষমতাও হ্রাস পায়। বাংলাদেশে সংসদীয় গনতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়টির সমাপ্তি এভাবে ঘটে। তবে এই ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে সংবিধান স্থগিত রাখা হয় এবং নভেম্বর মাসে সামরিক সরকার সংসদ ভেঙ্গে দেয়।

সামরিক সরকার প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর বেসামরিকীকরন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। নির্বাচনে ২৯টি রাজনৈতিক দল ও উপদল অংশ নেয়। তিনি সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল থাকে। রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা বিলোপ করা হলেও জাতীয় সংসদকে শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন জাতিগঠনমূলক কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন এবং বাংলাদেশের রাজনীতিকে এক নতুন খাতে প্রবাহিত করতে সচেষ্ট হন ঠিক তখনই ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সেনা বিদ্রোহে তিনি নিহত হন। সে মুহূর্তে উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার রাষ্ট্রপতির পূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং পরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু নির্বাচনের মাত্র ক'মাস পরে জেনারেল এরশাদ রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং দ্বিতীয় পার্লামেন্টের সমাপ্তি ঘটে।

জেনারেল এরশাদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রধান বিরোধী দলের একটি বড় অংশ এই নির্বাচনে অংশ গ্রহন না করায় এবং ব্যাপক "ভোট ডাকাতি" এর কারণে তৃতীয় জাতীয় সংসদ বৈধতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ এ সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ তারিখে চতুর্থ পার্লামেন্টের নির্বাচন সম্পন্ন করেন। নির্বাচনে সর্বমোট ৮টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো অংশ না নেয়ায় চতুর্থ সংসদও বৈধতা পায়নি।

১৯৮৮ সালের নির্বাচনের পর থেকে প্রধান বিরোধী দলগুলোর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন বেগবান হতে থাকে। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন এরশাদ ঘোষনা করলেন যে, আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন এবং কার্যতঃ তিনি নির্বাচনী প্রচারনায় অবতীর্ন হওয়ার প্রেক্ষাপটে, বিরোধী দলগুলোর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট আন্দোলনের লক্ষ্য ও ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা সম্পর্কে ১৯ নভেম্বর, ১৯৯০ ঘোষনা দেয় এই সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে হবে এবং তারা কেবল একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে "সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করবে। এই প্রেক্ষাপটে, ৪

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে এক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে এবং সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ তারিখে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে একটি নিদর্লীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদে ৬ আগষ্ট '৯১ তারিখে গৃহীত দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু তিন বছরের মধ্যেই পার্লামেন্ট বস্তুত: অকার্যকর হয়ে পড়ে। কয়েকটি উপ-নির্বাচনে অনিয়ম, কারচুপি ও সন্ত্রাসের অভিযোগে বিরোধী দলসমূহ ১৯৯৪ সালের মার্চ মাস থেকে সংসদ অধিবেশন বর্জন করে এবং একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভবিষ্যত পার্লামেন্ট নির্বাচনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু সরকার এ দাবী না মানায় ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর ১৪৭ জন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। ফলে সংসদ একদলীয় সংসদে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত মেয়াদ শেষ হবার ১০১ দিন পূর্বে ১৯৯৪ সালের ২৪ নভেম্বর তারিখে পঞ্চম পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী ষষ্ঠ পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিরোধী দলসমূহের নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধের কারণে এ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ছিলো খুবই কম এবং নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য। তাই বিরোধী দলসমূহ এই পার্লামেন্টের বৈধতা মেনে নেয়নি এবং ৩০ মার্চ ১৯৯৬ তারিখে তা ভেঙ্গে দেয়া হয়। বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে সরকার শেষ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী মেনে নেয় এবং ষষ্ঠ সংসদে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস করে। এই সংশোধনী অনুযায়ী ৩০ মার্চ '৯৬ সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এর নেতৃত্বে নিদর্লীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের অধীনে ১২ জুন '৯৬ সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

Objectives of Research

গবেষনা এক ধরনের জ্ঞান অন্বেষা যা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনুসন্ধানই এর উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি গবেষণার নিজস্ব উদ্দেশ্য থাকে। কোন কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য তা অপরিহার্য। উপস্থাপিত গবেষণা কর্মটি পঞ্চম জাতীয় সংসদ (১৯৯১-১৯৯৬) সময়ের এক সার্বিক রূপ চিত্রায়নের প্রয়াস হিসেবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এর প্রভাব বা গুরুত্ব নির্ধারণ করাই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের রাজনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করা হলেও আইন সভার ওপর তেমন গবেষণামূলক কাজ হয়নি। অথচ আইনসভা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজের আপামর জনসাধারনের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এর বাস্তব ভূমিকা বা কার্যকারিতা সম্পর্কে এদেশের সচেতন নাগরিকদেরও জানার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে (১৯৯১-১৯৯৬) এর পঞ্চম জাতীয় সংসদের বাস্তব চিত্র জনসম্মুখে তুলে ধরাই গবেষকের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

বর্তমান সন্দর্ভে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক পটভূমি এবং পঞ্চম পার্লামেন্টে বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এবং এর সামগ্রিক ভূমিকা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে পাঁচটি প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। যথাঃ

(১) পার্লামেন্ট তার সিদ্ধান্তমূলক কার্যাবলী সম্পাদনে কতটুকু সফল বা ব্যর্থ হয়েছে।

(২) ইহা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রন তথা সরকারের নীতি বা কর্মসূচীকে প্রভাবিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে কিনা?

(৩) এসব দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের সফলতা বা ব্যর্থতার প্রধান কারণগুলো কি?

(৪) পার্লামেন্টের কার্যকলাপ অর্থাৎ এর সফলতা বা ব্যর্থতা গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে?

Dhaka University Institutional Repository

(৫) সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ক্রমশ: কতটুকু পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই পরিবর্তিত হওয়ার পশ্চাতের কারণগুলো কি?

গবেষক যখন এই গবেষনা কাজ শুরু করেন তখন বাংলাদেশে সাতটি সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এই সাতটি সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদকে প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা হিসেবে গন্য করা যায় না। কারণ সংসদগুলোর নির্বাচন ছিলো মূলত সামরিক সরকারের অবৈধ ক্ষমতা বৈধ করণের লক্ষ্যে। ষষ্ঠ সংসদ ছিলো মাত্র বার দিনের একটি প্রহসনমূলক সংসদ, যেখানে মাত্র একজন বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলো। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বশীলতা বহুলাংশে এবং প্রধানত নির্ভর করে পার্লামেন্টে শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি এবং তাদের কার্যকর ও গঠনমূলক ভূমিকার ওপর। প্রথম সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা নেই বললেই চলে, এই পার্লামেন্টে তিনশত আসনের মধ্যে বিরোধী দলের আসন ছিলো মাত্র আটটি। প্রথম সংসদ নির্বাচনে সরকারী দল থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলো। পঞ্চম সংসদেই সদ্য পদত্যাগ প্রাপ্ত সরকারী দল ছাড়া অপর একটি দল বি. এন. পি. জামাতের সমর্থন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। পঞ্চম সংসদে অপর সংসদগুলো হতে প্রথমবারের মত কতগুলো ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো, যার ফলে গবেষক এই সংসদকেই গবেষণার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বেছে নিয়েছেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হলোঃ

(১) এ সংসদে সদ্য পদত্যাগ প্রাপ্ত সরকারী দল ক্ষমতায় না থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয় এবং পরাজিত হয়।

(২) একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে "সার্বভৌম সংসদ" প্রতিষ্ঠা হয়।

(৩) একটি শক্তিশালী প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের আবির্ভাব ঘটে। এ ছাড়া বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টিও যথেষ্ঠ শক্তিশালী ছিলো।

(৪) এ সংসদ ছিলো সবচেয়ে বেশী দিনের।

(৫) সকল মন্ত্রীই সরকার দলীয় সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ১৯ মার্চ '৯১ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর '৯১ পর্যন্ত তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী সকল নির্বাহী ক্ষমতা ছিলো রাষ্ট্রপতির হাতে। আইনত: প্রধান মন্ত্রী সহ সকল মন্ত্রী ছিলেন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মাত্র, অর্থাৎ যাকে বলা যায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পার্লামেন্টের কার্যকলাপ আলোচনায় গবেষণার সুবিধার্থে অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য পার্লামেন্টের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব হবে।

(১) সরকার পদ্ধতি তথা পার্লামেন্টের সাংবিধানিক মর্যাদার সংগে বাস্তব ভূমিকার কি কোনো কার্যকারন সম্পর্ক রয়েছে?

(২) পার্লামেন্টের গঠন অর্থাৎ প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধিত্ব, সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত মান, পেশাগত অবস্থান, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কি কোনো ভাবে পার্লামেন্টের ভূমিকাকে প্রভাবিত করে?

(৩) পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তমূলক কার্যাবলী তার নিজের এবং সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলে?

বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ (১৯৯১-১৯৯৬) সময়ের ওপর আলোকপাত করে গবেষকের জানা মতে তেমন গবেষণামূলক কাজ হয়নি। অধ্যাপক আবুল ফজল হক তাঁর বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি প্রবন্ধে বাংলাদেশ পার্লামেন্টের কেবল আইন প্রণয়ন ও শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রনমূলক কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন প্রধানত: এই বইটির ওপর ভিত্তি করে সংসদের কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। বিভিন্ন পেপার, পত্রিকা জার্নালে কিছু তথ্য রয়েছে। প্রধানত মূল তথ্য পাওয়া যাবে সরকারী দলিলপত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপরিষদ ও পার্লামেন্ট বিতর্ক, নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট, পার্লামেন্টের কার্যকলাপের সারাংশ, জাতীয় সংসদের বুলেটিন, কার্যপ্রনালী বিধি, সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত ইত্যাদি।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত জাতীয় সংসদের কার্যকলাপ ছিলো বহুদলীয় ও একদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে এবং বিষয়টি স্পষ্ট করে আলোচনা করার জন্য উভয় প্রকার সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে সংসদে কতটুকু কাজ হয়েছে তা পৃথকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

Research Methodology

আমি এ গবেষণা প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে একাধারে ঐতিহাসিক, অভিজ্ঞতামূলক, বিশ্লেষণমূলক ও তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহে প্রাথমিক উৎস (Primary Sources) এবং মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources) ব্যবহার করেছি। প্রাথমিক উৎস হিসেবে একটি জরিপ কার্য পরিচালনা করেছি। ক্ষেত্র পর্যায়ের লক্ষ্য ও নমুনা জনগোষ্ঠী ছিলেন জাতীয় সংসদ সদস্য, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও ছাত্র। এদের মতামত জরিপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে। প্রশ্নমালা অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত সমূহ সমন্বিত করেছি এবং তা প্রয়োজনীয় স্থানে যথাযথভাবে সংযোজিত করেছি।

মাধ্যমিক উৎস সমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গবেষকের গবেষণা কর্ম ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত সমূহ। অন্যদিকে গবেষণা কার্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য দলিল পত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারী দলিলপত্র (Public documents) । এগুলো হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপরিষদ (Constituent Assembly) ও জাতীয় সংসদের বিতর্ক (Debates), জাতীয় সংসদের কার্যকলাপের সারাংশ (Summary of the Proceedings), বুলেটিন, নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট, সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত (Bio-data of the Members of the Jatio Sangsad), নির্বাচনী ইস্তেহার (Election Manifesto), পুস্তিকা, প্রচারপত্র, সংবাদপত্র ও বিভিন্ন বই পুস্তক ও প্রবন্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১। মোঃ আব্দুল হালিম, **সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতিঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ**, প্রকাশকঃ মোঃ ইউসুফ আলী খান, গুলশান, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠাঃ ১৮১।

২। সত্যসাধন চক্রবর্তী, নিমাই প্রামানিক, **নির্বাচিত আধুনিক শাসনব্যবস্থা**, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, জুলাই ১৯৮০, পৃষ্ঠাঃ ১৪০-১৫১।

৩। W.F. Willoughby, **Government of Modern States**, New York, 1936, PP. 312-320.

৪। Fred R. Harris, **American Democracy**, New Mexico, 1983, PP. 382-390.

৫। সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামানিক **প্রাগুক্ত**, পৃষ্ঠাঃ ৯৪।

৬। Michael Stewart, **The British Approach to Politics**, London, 1967, PP. 119-125.

৭। সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামানিক, **প্রাগুক্ত**, পৃষ্ঠাঃ ১২২।

৮। D.C. Gupta **Indian National Movement and Constitutional Development**, Delhi, 1973, PP. 485-490.

৯। Peter Pyne, "Legislature and Development: The Case of Eduader, 1960-61" **Comparative Political Studies**, Vol. 9, No. 1, April 1976, P. 70.

১০। ঐ, পৃষ্ঠাঃ ৭৩।

১১। ঐ, পৃষ্ঠাঃ ৮০-৮১।

১২। **"Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman,"** অধ্যায়ঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১০৪, উদ্ধৃত হয়েছেঃ ড. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া সম্পাদিত, **বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন**, রয়েল লাইব্রেরী, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৭ এপ্রিল, ১৯৮৯, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৮।

১৩। অধ্যাপক এনামউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), **বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা**, কয়িন বুক করপোরেশন, ঢাকা, মে ১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- ২

জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ক্ষমতা, কার্যাবলী ও মর্যাদা

Constitutional Structure of Jatio Sangsad and its Working Procedure Powers Activities and Status

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ইতিহাস ত্যাগ ও সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কয়েকবার সেনাবাহিনীর আগমন ঘটেছে, গণতন্ত্র বাধাগ্রস্থ হয়েছে। পাঁচটি পার্লামেন্টে চার ধরনের সরকার প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে প্রথম পার্লামেন্টে বহুদলীয় সংসদীয় সরকার এবং একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা। পঞ্চম পার্লামেন্ট বহুদলীয় সংসদীয় সরকারের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করলেও সংসদ থেকে বিরোধী দলের পদত্যাগের ফলে তা প্রকান্তরে একদলীয় সরকার ব্যবস্থাতেই পরিণত হয়। এ অধ্যায়ে জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক কাঠামো, কার্য-পদ্ধতি, ক্ষমতা ও কার্যাবলী এবং মর্যাদা আলোচনা করার সাথে সাথে বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক পরিবর্তনগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

সংসদের কাঠামো

১. সংসদ প্রতিষ্ঠা

পৃথিবীর সকল দেশে আইনসভা সমূহের গঠন প্রকৃতি এক রকম নয়। তবে আইনসভা সমূহকে এককক্ষ বিশিষ্ট ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা এ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নিউজিল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, তুরস্ক, নেপালসহ আরও অনেক দেশের আইনসভা এককক্ষ বিশিষ্ট। অপর দিকে গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান, কানাডা, ভারত ও পাকিস্তানসহ অনেক দেশে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা চালু রয়েছে। ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অধীনে বাংলাদেশের জন্য "জাতীয় সংসদ" নামে একটি এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হয়। এটি ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত।

জাতীয় সংসদ ৩১৫ জন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এর মধ্যে ৩০০টি আসনের সদস্যগন সাধারণ নির্বাচনী এলাকা থেকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। অন্যূন ১৮ বছর বয়স্ক বাংলাদেশের নাগরিকগণ ধর্ম, বর্ণ, পেশা, বংশ এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষ সবাই সংসদ সদস্যদের নির্বাচনে ভোট দান করতে পারবেন (অনুচ্ছেদ- ১২২)। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে ১০ বৎসরের জন্য অতিরিক্ত ১৫টি

Dhaka University Institutional Repository

আসন কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো। তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তবে মহিলাগণ অন্যান্য নির্বাচনী এলাকা থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।[১] ১৯৭৯ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা পনের জন থেকে বৃদ্ধি করে ত্রিশ জন করা হয়। পুনরায় ১৯৯০ সালে সংবিধানের দশম সংশোধনী আইন দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদ সংশোধন করে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ত্রিশটি আসনের সময়সীমা দশ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়।

২. সংসদ সদস্যপদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হলে এবং তার বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হলে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন। কিন্তু কেউ যদি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হতেন বা দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর দায় থেকে অব্যাহতি না পেতেন, বা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন কিংবা নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারী অপরাধে দু'বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হতেন ও মুক্তি লাভের পর পাঁচ বছরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে, বা প্রজাতন্ত্রের কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন, অথবা আইনের দ্বারা নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষিত হতেন, তাহলে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার এবং সংসদ সদস্য থাকবার যোগ্য হবেন না (অনুচ্ছেদঃ ৬৬)[২]।

৩. সংসদের মেয়াদ

জাতীয় সংসদ পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবে। তবে অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে যে কোনো সময় সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পূর্বে সংসদ ভেঙ্গে না দিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে পাঁচ বছর অতিবাহিত হলে সংসদ ভেঙ্গে যাবে। তবে বাংলাদেশ যুদ্ধে লিপ্ত থাকবার কালে সংসদ এর মেয়াদ আইন দ্বারা এক সময় অনধিক এক বছর বর্ধিত করতে পারত। কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্ত হলে বর্ধিত মেয়াদ কোনোক্রমে ছয়মাসের বেশী হবে না। সংসদ ভেঙ্গে যাবার পর এবং পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, প্রজাতন্ত্রী যে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে, সেই যুদ্ধাবস্থার জন্য সংসদ পুনরায় আহবান করা প্রয়োজন, তা হলে যে সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিলো, রাষ্ট্রপতি তা আহবান করবেন।[৩] ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদ সংশোধন করায় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারতেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪. স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

প্রতিটি নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। কিছু আইন পরিষদে অন্য পদবির ব্যক্তিরাও সভাপতিত্ব করেন। ব্রিটিশ লর্ড সভায় সভাপতিত্ব করেন লর্ড চ্যান্সেলর (Lord Chancellor)। মার্কিন সিনেটে পদাধিকার বলে সভাপতিত্ব করেন সে দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট।[৪] জাতীয় সংসদের সভাপতিকে স্পীকার বলে। প্রত্যেক সাধারন নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সদস্যগণ তাঁদের মধ্য হতে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করেন। সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত প্রস্তাবের দ্বারা স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারকে অপসারন করা যায়। স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হবে, যদি তিনি (ক) সংসদ সদস্য না থাকেন, (খ) মন্ত্রী পদ গ্রহন করেন, কিংবা (গ) রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করেন, (ঘ) কোনো সাধারন নির্বাচনের পর অন্য কোন সদস্য তার কার্যভার গ্রহন করেন, অথবা (ঙ) ডেপুটি স্পীকারের ক্ষেত্রে তিনি স্পীকারের পদে যোগ দান করেন। স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হলে সাত দিনের মধ্যে কিংবা ঐ সময়ে সংসদ বৈঠকরত না থাকলে পরবর্তী প্রথম বৈঠকে তা পূর্ণ করবার জন্য সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে নির্বাচিত করবেন।[৫]

স্পীকারের পদ শূন্য হলে বা তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালনে রত থাকলে কিংবা অন্য কোন কারনে তিনি স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ হলে স্পীকারের সকল দায়িত্ব ডেপুটি স্পীকার পালন করবেন, কিংবা ডেপুটি স্পীকারের পদ শুন্য হলে, কিংবা উভয়ই সংসদের কোনো বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী কোনো সংসদ সদস্য স্পীকারের দায়িত্ব পালন করবেন।[৬] মূল সংবিধানে বিধান ছিলো যে, রাষ্ট্রপতির পদ শুন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারনে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্বভার গ্রহন না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।[৭] ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা একটি উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয়। এতে বিধান করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি উপযুক্ত কারনে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে উপরাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালন করবেন এবং উভয়ই দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি স্বীয় কার্যভার গ্রহন না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতি রূপে কাজ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

পার্লামেন্ট পরিচালনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্পীকারের। আধুনিক ব্যবস্থায় স্পীকার একটা দল থেকে নির্বাচিত হন বটে, তবে নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর স্পীকারকে নিরপেক্ষ হতে হয়। তাঁর নিরপেক্ষতা পার্লামেন্টের রক্ষাকবজ। পার্লামেন্টে স্পীকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং পার্লামেন্ট বিধি অনুযায়ী তা পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। তাঁর সিদ্ধান্ত ও রুলিং অবশ্য পালনীয়। হাউসে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্পীকার প্রয়োজনে সদস্যদের বহিস্কার করতে পারেন। পার্লামেন্ট পরিচালনায় তার ক্ষমতা একচ্ছত্র বলে এ পদাধিকারীর পক্ষপাতহীন ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আচরন ও গুনাবলীর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।[৮] ইংল্যান্ডে স্পীকারকে সাধারণত: সরকারী দলের ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বোঝাপরার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়। দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হলেও স্পীকার ব্যক্তিগত ইচ্ছার উর্ধ্বে থেকে দলমত নির্বিশেষে সবদলের নিকট গ্রহন যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে কার্য সম্পাদন করেন।[৯] অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি সভার স্পীকার নির্বাচিত হবার পরও দল নিরপেক্ষ থাকেন না। তিনি তার দলের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। এমনিক প্রতিনিধি সভার ভিতরেও স্পীকার গোপনে তাঁর দলের নেতাদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।[১০] বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের স্পীকারও নির্বাচিত হবার পর নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে দল থেকে পদত্যাগ করেন না।

বাংলাদেশে এখনও স্পীকারের ভূমিকা বিতর্কহীন ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়ে উঠেনি। তবে স্পীকার যাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাঁর কর্তব্য পালন করতে পারেন তজ্জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে কতিপয় ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলো হলো: (১) স্পীকার সংসদে সাধারনত ভোটদান করবেন না। যখন কোনো বিষয়ে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হয়, তখনই কেবল তিনি তাঁর নির্ণায়ক ভোট প্রদান করবেন।[১১] (২) সংসদের কার্যপরিচালনা, শৃঙ্খলা রক্ষা বা তার অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে স্পীকার কোন আদালতের এখতিয়ারের অধীন হবে না।[১২] (৩) স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারকে দেয় পারিশ্রমিক সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয়রূপে গন্য হবে।[১৩] তবে বাস্তব ক্ষেত্রে স্পীকারের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নির্ভর করবে দেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডল, অভ্যাস ও ঐতিহ্য সৃষ্টির ওপরে।

সংসদের কার্য পদ্ধতিঃ

গণতান্ত্রিক দেশের আইনসভাগুলো স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বীয় রচিত বিধি অনুযায়ী তাদের কাজ পরিচালনা করে। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিধান করা

Dhaka University Institutional Repository

হয় যে, জাতীয় সংসদ তার নিজস্ব কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়ন করবে এবং অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হবে।[১৪] এই বিধান মতে বাংলাদেশের প্রথম কার্যপ্রণালী বিধি রাষ্ট্রপতি ১৯৭৩ সালের ১ এপ্রিল জারি করেন। ইহা ব্রিটিশ ঐতিহ্য এবং দীর্ঘ দিন থেকে পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার যে অভিজ্ঞতা তার ভিত্তিতে প্রণীত (দেখুন Begnal Legislative Council)। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদ কর্তৃক কার্যপ্রণালী বিধিটির কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। নিম্নে সংসদের কার্যপ্রণালী আলোচনা করার সাথে বিভিন্ন সময়ে উহার পরিবর্তিত বিধান তুলে ধরা হলো।

১. সংসদের অধিবেশন

রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহবান, স্থগিত ও ভঙ্গ করার ক্ষমতা রাখেন। এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না। যেকোন সাধারন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদের অধিবেশন আহবান করতে হবে।[১৫]
কিন্তু ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গৃহীত সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর দ্বারা এই বিরতির ব্যবধান ষাট দিন থেকে বাড়িয়ে একশত বিশদিন করা হয়। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে গৃহীত সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবধান আরো বৃদ্ধি করে বিধান করা হয় যে, প্রতিবছর জাতীয় সংসদের অন্তত দুটি অধিবেশন বসবে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পার্লামেন্টে অনুরূপ অবস্থাই বহাল থাকে। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত ব্যবস্থায় মূল সাংবিধানিক বিধি প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ এক অধিবেশন সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশন শুরুর মধ্যে বিরতি ষাট দিনের বেশী হবে না। পঞ্চম পার্লামেন্টেও এই বিধিই কার্যকর থাকে।

২. সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহন পদ্ধতি

সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণয়ক ভোট প্রদান করবেন (অনুচ্ছেদঃ ৭৫(১)(খ)।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সংসদের কার্যধারার বৈধতা যাচাই

সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য রয়েছে, কেবল এ কারণে বা সংসদে উপস্থিত হবার বা ভোটদানের বা অন্য কোনো উপায়ে কার্যধারায় অংশগ্রহনের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি অনুরূপ কাজ করেছেন, কেবল এ কারণে সংসদের কোনো কার্যধারা অবৈধ হবে না (অনুচ্ছেদ: ৭৫(১)(গ)। শপথ গ্রহনের পূর্বে কোনো সদস্য সংসদে আসন গ্রহন বা ভোট দান করলে অনুরূপ কাজের জন্য তিনি প্রতিদিন একহাজার টাকা করে অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন (অনুচ্ছেদ: ৬৯)।

৪. কোরাম

সংসদে কার্য পরিচালনার জন্য অন্যূন ষাট জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন। বৈঠক চলাকালে ষাট জনের কম সদস্য উপস্থিত আছেন বলে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, তিনি অন্যূন ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখবেন কিংবা মুলতবী করবেন।[১৬]

৫. সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি

সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীদের উপর সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রন, কার্য পরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে, তিনি তার ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কোন আদালতের এখতিয়ারাধীন হবেন না। সংসদ বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোট দানের জন্য কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে মামলা করা যাবে না। সংসদ কর্তৃক বা এর কর্তৃত্বে কোনো রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে কোনো কার্যধারা গ্রহন করা যাবে না।[১৭]

৬. কার্যাবলী বিন্যাস

সংসদের কার্যাবলীকে সরকারী সদস্যের কার্যাবলী এবং বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলী এ দু শ্রেনীতে বিভক্ত করা যায়। কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল, বাজেট, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাব বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলী বলে গন্য হবে। প্রতি বৃহস্পতিবারে বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলী প্রাধান্য পাবে এবং অন্যান্য দিনে কেবল মাত্র সরকারী কাজ করা যাবে।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

৭. আইন প্রনয়ন পদ্ধতি

বাংলাদেশে আইন প্রনয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। আইনের খসড়া বা প্রস্তাবকে "বিল" বলে। বিল দু'প্রকারের হতে পারে, যেমন: বেসরকারী বিল (Private Members Bill) এবং সরকারী বিল (Government Bill)। যে সকল বিল সংসদের সাধারণ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয় সেগুলোকে বেসরকারী বিল বলে, এবং যে সমস্ত বিল মন্ত্রীগন উত্থাপন করেন সেগুলোকে সরকারী বিল বলে।

প্রথম ভাগঃ বিল উত্থাপন- কোনো বেসরকারী সাধারণ সদস্য বিল উত্থাপন করতে চাইলে তিনি সংসদ সচিবের নিকট পনের দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান এবং সঙ্গে বিলের তিনটি প্রতিলিপি পেশ করবেন। কিন্তু মন্ত্রীদের বেলায় মাত্র সাত দিনের নোটিশ ও দু'টি প্রতিলিপির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন মন্ত্রনালয় বা দপ্তর প্রয়োজন অনুসারে আইন পাসের প্রস্তাব মন্ত্রীসভার নিকট পেশ করে এবং মন্ত্রীসভা অনুমোদন করলে আইন ও সংসদ বিষয়ক দপ্তর প্রস্তাবিত আইনের খসড়া রচনা করে। পরে ভারপ্রাপ্ত সদস্য নামে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগন বিভিন্ন বিল সংসদে উত্থাপন করেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা ভারপ্রাপ্ত সদস্য কোনো বিল উত্থাপনের অনুমতির জন্য সংসদে প্রস্তাব করেন। সংসদ অনুমতি দিলে উক্ত সদস্য বিলটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উত্থাপন করেন।[১৯] এ পর্যায়ে কোন আলোচনা হয় না।

দ্বিতীয় বিভাগঃ বিলের প্রকাশন- এ পর্যায়ে সচিব বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি এবং প্রযোজ্য হলে আর্থিক স্মারকলিপিসহ উত্থাপিত প্রত্যেকটি বিল গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।[২০] অবশ্য রাষ্ট্রপতি কোনো সরকারী বিল উত্থাপিত হবার পূর্বেই তা গেজেটে প্রকাশ করার নির্দেশ দিতে পারেন।

তৃতীয় ভাগঃ বিল বিবেচনা- বিল উত্থাপনের পর ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রস্তাব করতে পারেন যে, বিলটি (ক) সংসদে বিবেচিত হোক; (খ) স্থায়ী কমিটির নিকট প্রেরণ করা হোক; (গ) বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করা হোক; এবং (ঘ) জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রচার করা হোক। এ পর্যায়ে ভারপ্রাপ্ত সদস্য বিলটির উদ্দেশ্য ও উহা পাসের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেন। সদস্যগন বিলটির নীতি ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারেন। এবং উপযুক্ত চার প্রকার প্রস্তাবের উপর সংশোধনী উত্থাপন করতে পারেন। আলোচনার পর বিলটি নীতিগতভাবে গৃহীত হলে, উহা হয় কমিটির নিকট পাঠান হয় নতুবা বিবেচনা করা হয়।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি পর্যায়ঃ কোন বিল স্থায়ী বা বাছাই কমিটিতে পাঠান হলে কমিটির সদস্যগন বিলটির প্রত্যেকটি ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করেন এবং উহার ভাষাগত দুর্বলতা বা অস্পষ্টতা থাকলে এর উন্নতির জন্য সুপারিশ করেন। কমিটি বিলের আসল উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে না পারলেও সংশোধনের জন্য সুপারিশ করতে পারেন।[২২]

রিপোর্ট পর্যায়ঃ বিচার বিবেচনার পর কমিটি রিপোর্ট রচনা করে এবং কমিটির চেয়ারম্যান উহা সংসদে পেশ করেন। তখন কমিটির রিপোর্ট ও সংশোধিত বিল গেজেটে প্রকাশ করা হয়। এরপর ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রস্তাব করতে পারেন যে কমিটি কর্তৃক প্রেরিত বিল বিচার বিবেচনা করা হোক, অথবা পুনর্বার কমিটির নিকট পাঠান হোক, অথবা জনসাধারনের মতামত গ্রহনের জন্য প্রচার করা হোক।[২৩]

দফাওয়ারী আলোচনাঃ কমিটি কর্তৃক প্রেরিত কোনো বিল সম্পর্কে বিচার বিবেচনার প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হলে বিলটির বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা চলে। এই পর্যায়ে সদস্যগন সংশোধনী প্রস্তাব উথাপন করেন এবং স্পীকার বিভিন্ন ধারা ও তফসিল এবং ঐগুলোর ওপর আনীত সংশোধনীর ওপর ভোট গ্রহন করেন।[২৪]

চতুর্থ ভাগঃ বিল পাস- বিলের সকল ধারা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা ও ভোট গ্রহন সমাপ্ত হওয়ার পর বিলের চতুর্থভাগে প্রস্তাব করা হয় যে, বিলটি গ্রহন করা হোক। এ ভাগে মৌখিক বা আনুষ্ঠানিক ছোট-খাট সংশোধনী ছাড়া কোনো মৌলিক সংশোধনী উথাপন করা যায় না। বিলটিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহন বা প্রত্যাখানের প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক চলে। বিল পাসের জন্য উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে বিলটি গৃহীত হবার পর স্পীকার উহা সত্যায়িত করেন এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরন করেন। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে সচিব অবিলম্বে বিলটিকে সংসদের আইনরূপে গেজেটে প্রকাশ করেন।[২৫]

পঞ্চম ভাগঃ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ফেরৎ পাঠানো বিল পুনর্বিবেচনা- সংসদে গৃহীত কোনো বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি না দিয়ে যদি সংসদে ফেরত পাঠান তবে সংসদ উহার পুনর্বিবেচনা করবে। সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহন করলে রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হবে। রাষ্ট্রপতি সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি না দিলে সম্মতি ব্যতিরেকেই বিলটি আইনে পরিণত হবে।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

Powers and Functions of the Jatio Sangsad

সকল সরকার পদ্ধতিতে পার্লামেন্টের ক্ষমতা এক ধরণের নয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগকে গুরুত্ব ও মর্যাদা বেশী দেয়া হয় বলে এ সরকার ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। তবে গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর মধ্যে সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে বলে এক্ষেত্রে পার্লামেন্ট সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা সাধারণত: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে সেখানে নির্বাহী বিভাগের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রন অপেক্ষাকৃত কম থাকে। তবে একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় আইনসভাকে তেমন ক্ষমতা দেয়া হয় না। সামরিক শাসন বাদ দিয়ে বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে (১৯৭২-১৯৯০) সাল পর্যন্ত এ তিন প্রকারের সরকার ব্যবস্থাই ছিল। পঞ্চম পার্লামেন্টে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হলো।

৫-২-৯২ তারিখের গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত সংসদ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা শর্তাংশটি সন্নিবেশিত।

১. আইন প্রণয়ন (Legislation)

বাংলাদেশে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ন্যস্ত। তবে সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে আইনে পরিণত হয়। কোন বিল রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার পনের দিনের মধ্যে তিনি তাতে সম্মতি দান করবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য তাঁর সুপারিশসহ সংসদে ফেরত পাঠাবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি তা করতে অসমর্থ হলে, উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গন্য হবে। তবে রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি সংসদে ফেরত পাঠান, তাহলে সংসদ বিলটি সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতীত মোট সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পুনরায় পাস করলে তা রাষ্ট্রপতির নিকট আবার উপস্থাপিত হবে এবং তিনি সাতদিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতিদানে অসমর্থ হলে উক্ত সময়ের অবসানে তাঁর সম্মতি ব্যতীত বিলটি আইনে পরিণত হবে।[২৭] এক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বৃটে ও ভারতের ন্যায় একক ক্ষমতার অধিকারী। কেননা, ইংল্যান্ডের রাজা বা রানী আইনত পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে তিনি তা করেন না।[২৮] অনুরূপভাবে, ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা থাকলেও তিনি যেহেতু,

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন। কাজেই তার ভেটো প্রয়োগ ক্ষমতার অবকাশ নেই। সংসদীয় শাসনামলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের অবাধ-ক্ষমতা ছিলো। কিন্তু একদলীয় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা হ্রাস পায়। কেননা সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলে রাষ্ট্রপতি ভেটো প্রয়োগ করতে পারতেন।[২৯] তার ভেটোকে অতিক্রম করার ক্ষমতা কারো ছিলো না। রাষ্ট্রপতি শাসনামলে ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা রাষ্ট্রপতির ভেটো রহিত করা হয় এবং অন্য সকল বিধি সংসদীয় সরকারের অনুরূপ ছিলো।

২. আর্থিক নিয়ন্ত্রন (Financial Control)

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা রাষ্ট্রের অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়ন্ত্রন করে থাকে। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে সংসদের আইন বা কতৃত্ব ব্যতীত কোনো কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাবে না (অনুচ্ছেদঃ ৮৩)। সরকার প্রতি বছর আয়-ব্যয়ের অনুমিত হিসাব সংবলিত একটি বাজেট সংসদে উপস্থাপিত করবেন [অনুচ্ছেদঃ ৮৭ (১)]। সংযুক্ত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যয়সমূহ সংসদে আলোচিত হবে; কিন্তু উহার ওপর ভোট গ্রহন করা হবে না [অনুচ্ছেদঃ ৮৯ (১)]। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত ব্যয় সংক্রান্ত কোনো বিল বা মজুরী দাবী সংসদে উত্থাপন করা যায় না।[৩০] ইংল্যান্ড এবং ভারতেরও পার্লামেন্টের আইন ব্যতীত সরকার কোনো কর ধার্য বা সংগ্রহ করতে পারে না। সে সব দেশেও পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে বার্ষিক বাজেট কার্যকর হয়।[৩১]

একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসনামলে অর্থ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। রাষ্ট্রপতিই অর্থ সংক্রান্ত সকল বিষয় নিয়ন্ত্রন করতেন; এমনকি অর্থ বিলেও রাষ্ট্রপতি ভেটো প্রয়োগ করতে পারতেন।[৩২] কিন্তু পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা জাতীয় সংসদের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা খর্ব করে বিধান করা হয় যে, সংসদের কোন অর্থ বছরে সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয় ছাড়া অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত মজুরী দাবী মঞ্জুর করতে অসমর্থ হলে বা হ্রাস করলে কিংবা সংযুক্ত তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্দিষ্টকরণ আইনে পাস না করলে রাষ্ট্রপতি ১২০ জনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের অনুমতি দিতে পারতেন।[৩৩] দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদের আর্থিক নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা পুনরায় ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অনুযায়ী কার্যকরী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩. শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রন

Controlling the Executiver

মূল সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশের শাসন বিভাগ তাদের যাবতীয় কার্যের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকবে। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদের এই ক্ষমতা খর্ব করা হয়।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংসদীয় সরকার বিলুপ্ত হওয়ার পর দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় পঞ্চম পার্লামেন্টে সংসদীয় সরকার প্রবর্তিত হওয়ায় পার্লামেন্টের অন্যতম ক্ষমতা ছিলো মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রন করা। সংবিধানে বিধান করা হয় যে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে এবং মন্ত্রীসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবে। প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য সকল মন্ত্রীদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করবেন।[৩৪] করলে কিংবা সংযুক্ত তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁর কর্তৃত্বে সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হতো। এখানে উল্লেখ্য যে ভারতে নির্বাহী ক্ষমতা আইনত রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। মন্ত্রীসভা তাঁকে সাহায্য ও পরামর্শদান করেন। ইংল্যান্ডে তত্ত্বগতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজা বা রানীর ওপর ন্যস্ত কিন্তু প্রথাগতভাবে ভারত ও বৃটেন উভয় দেশের রাষ্ট্র প্রধানই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। অনুরূপভাবে, বাংলাদেশের সংবিধানে সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হলেও বাস্তবে সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রীসভা যতক্ষন সংসদের আস্থা ভোগ করবেন, ততক্ষন পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। সংসদ সদস্যগন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও বিভিন্ন প্রকার প্রস্তাব উথাপনের মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা করে থাকেন। সংসদে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে অনাস্থা প্রস্তাব পাশে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী যেকোন সময় সংসদ ভেঙ্গে দিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করতে পারেন এবং সে অনুসারে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দিবেন। বৃটেন ও ভারতের আইনসভা ভেঙ্গে দেবার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।[৩৫] সংসদে সরকারী দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং এ অবস্থায় সংসদ মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রন করার পরিবর্তে কার্যতঃ মন্ত্রীসভাই সংসদকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে। সুতরাং সংসদের প্রধান কাজ হচ্ছে সরকারী নীতি ও কার্যকলাপের সমালোচনা করা। সরকারী কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি শাসন সংক্রান্ত কাজে সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। তবে সংসদের সম্মতি

Dhaka University Institutional Repository

ব্যতীত নির্বাহী বিভাগ যুদ্ধ ঘোষনা করতে পারে না কিংবা বাংলাদেশ কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে পারে না [অনুচ্ছেদঃ ৬৩ (১১)]।

সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের ওপর জাতীয় সংসদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রন ছিলো। কিন্তু ১৯৭৫ সালে প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা খর্ব হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত না হয়ে জনগনের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হতেন। এরূপ একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ সংসদের নিকট দায়ী ছিলো না। রাষ্ট্রপতিই মন্ত্রীদের নিয়োগ করতেন এবং তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী মন্ত্রীগন স্বপদে বহাল থাকতেন।[৩৬] মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদ কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারত না তবে মুলতবী প্রস্তাব, মনোযোগ আকর্ষনী প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রস্তাব প্রভৃতি সংসদীয় পদ্ধতিগুলি বহাল ছিলো। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা চালু হলেও এর দ্বারা সরকারের প্রকৃতিগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় সরকারের ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার সকল সদস্যকেই সংসদের সদস্য হতে হতো। চতুর্থ সংশোধনীর অধীনে রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্য হবার যোগ্য যে কোনো ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারতেন কিন্তু পঞ্চম সংশোধনীতে বিধান করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের অনধিক এক-পঞ্চমাংশ সদস্য সংসদের বাহির হতে নিযুক্ত করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে সাধারণত মন্ত্রীরা সংসদ সদস্য থাকতে পারেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থায় মন্ত্রীরা পার্লামেন্টে উপস্থিত থাকতে কিংবা সংসদীয় কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন না।

৪. বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

Judicial Power

রাষ্ট্রের বিচার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্ট ও অন্যান্য আদালতের উপর ন্যস্ত। সাধারণতঃ বিচার কার্য বলতে যা বোঝায় সংসদের সেরূপ কোন কার্য নেই। তবে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ কিংবা শারীরিক অসমর্থের কারণে জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে নির্বাচন কমিশনার সরকারী কর্ম-কমিশনার, প্রধান বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায়।[৩৭] তবে বিচারপতি অপসারণ প্রক্রিয়া পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে যে বিধান করা হয় তা পঞ্চম পার্লামেন্টে বহাল থাকে। প্রধান বিচারপতি ও দুজন সর্বাপেক্ষা সিনিয়র বিচারপতির সমন্বয়ে একটি "সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল" থাকবে। উক্ত কাউন্সিল কোনো বিচারকের শারীরিক অসামর্থ্য ও গুরুতর অসদাচরনের জন্য তদন্ত করে রাষ্ট্রপতির নিকট যে রিপোর্ট দিবেন, সেই অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন বিচারক দোষী তাহলে তিনি আদেশের দ্বারা উক্ত বিচারককে তার পদ হতে অপসারিত করবেন।[৩৮] অপর দিকে, প্রথম সংসদে বিচারপতি অপসারণ প্রক্রিয়া রাষ্ট্রপতি কিংবা নির্বাচন কমিশনার অপসারণের ন্যায় ছিলো। ভারতের পার্লামেন্টও সে দেশের বিচারকদের এবং রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করার ক্ষমতা ভোগ করে।[৩৯] ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে বিচারকদের অপসারণের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা বিলুপ্ত করে তা এককভাবে রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যাস্ত করা হয়। তবে সংবিধান লংঘন কিংবা অসদাচারণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করার ক্ষমতা সংসদের ওপর বহাল ছিলো। এ অভিযোগ সম্বলিত প্রস্তব জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে উথাপিত হলে এবং তা তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের দ্বারা গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যেত।[৪০] বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে শারীরিক অসামর্থ্য কিংবা সংবিধান লংঘনের অভিযোগে বিচারকদের অপসারণ প্রক্রিয়া পঞ্চম পার্লামেন্টের অনুরূপ ছিলো।

৫. সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা

Powers Relating to Constitution

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা এককভাবে জাতীয় সংসদের ওপর ন্যাস্ত। সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন বা রহিত করার নিমিত্তে পার্লামেন্টের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে কোনো বিল গ্রহন করলে তা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরন করা হয়। রাষ্ট্রপতি সাতদিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দান করবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত সাতদিন মেয়াদ অবসানে রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গন্য হবে।[৪১] একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা পূর্বের মতই বহাল ছিলো। রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য বিলে ভেটো প্রদানে সমর্থ হলেও তিনি সংবিধান সংশোধন বিলে ভেটো দিতে পারতেন না। কিন্তু ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা জাতীয় সংসদের সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতা বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি আমলে সংকুচিত হয়। সংসদ দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধানের যে কোন বিধান সংশোধনের লক্ষ্যে বিল গ্রহন করতে পারত। তবে সংবিধানের কতিপয় বিধান, যথা প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ যথাক্রমে ৮ (রাষ্ট্রীয় আদর্শ), ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

(মন্ত্রীপরিষদের গঠন ও ক্ষমতা), ৪৮, ৮০ ও ৯২ (ক) (রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা) এবং ১৪২ (সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি) সম্পর্কিত কোনো সংশোধনী বিল মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হবার পর তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হতো। রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি দান করবেন কি করবেন না তা নির্ধারনের জন্য বিষয়টি গণ ভোটে দিতেন। গণভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হলেই তা কার্যকর হতো।[৪২]

জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক মর্যাদা

Constitutional Status of the Jatio Sangsad

আইনসভার মর্যাদার কথা বিবেচনা করলে দুই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এই দুই প্রকার রাষ্ট্রব্যবস্থার একটিতে সংসদের সার্বভৌমত্ব ও অপরটিতে সংবিধানের সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ বৃটেন ও মার্কিন রাষ্ট্র ব্যবস্থার উল্লেখ করা যায়। বৃটিশ সংবিধানের মূলতত্ত্ব হলো সংসদের সার্বভৌমত্ব (Soverignty of the Parliament)। অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের সার্বভৌমত্ব (Supermacy of the Constitution) বিদ্যমান। বৃটিশ সংবিধান প্রধানতঃ অলিখিত এবং সুপরিবর্তনীয়। সেখানে সাধারণ আইন এবং সাংবিধানিক আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না এবং পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ওপর কোনো আইনগত বাধা নেই। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পার্লামেন্ট যে কোন প্রকার আইন প্রণয়ন পরিবর্তন বা রদ করতে পারে। বৃটিশ রাজা-রানী কোনো আইনে ভেটো প্রদান করেন না। আদালত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে, কিন্তু পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইনকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। পার্লামেন্টের সকল আইন আদালতের নিকট বৈধ। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই সর্বোচ্চ আইন এবং সরকারের সকল অঙ্গ সংবিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে কাজ করতে বাধ্য। সুতরাং মার্কিন কংগ্রেস (আইনসভা) সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন নয়। কংগ্রেস কেবল সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা ভোগ করবে এবং কংগ্রেস সংবিধানের পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করলে তা অবৈধ বলে গন্য হবে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাকারক ও অভিভাবক। সংবিধানের অর্থ কি এবং আইনসভা ও শাসন বিভাগ সংবিধানের নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করছে কিনা, তা বিবেচনার ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিয়ে সুপ্রীমকোর্ট কার্যতঃ নিজের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তই শেষ কথা নয়; সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা আইনের বৈধতা নির্ধারণ করে। তাছাড়া মার্কিন

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত বিলে ভেটো প্রদান করতে পারেন এবং অনুরূপ ভেটো অতিক্রম করতে হবে কংগ্রেসের উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে ঐ বিল পুনরায় পাস করতে হয়।[৪৩]

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ বৃটিশ পার্লামেন্টের ন্যায় সার্বভৌম সংস্থা নয়, আবার মার্কিন কংগ্রেসের ন্যায় তার ক্ষমতাও তত সীমাবদ্ধও নয়। এদিক থেকে বলা যায় ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশ সংবিধান পার্লামেন্টের জন্য ব্রিটেনের ন্যায় সংসদের প্রাধান্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের প্রাধান্য এই দুই ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্থান নির্দেশ করে। কিন্তু সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হবার ফলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়। ফলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। তবে পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হলে সংসদের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম পার্লামেন্টে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে ফিরিয়ে নেয়া হয়।

ব্রিটেন ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সাথে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান বাংলাদেশ সংবিধানে জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক মর্যাদার তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

জাতীয় সংসদ কোন বিল পাস করলে তাতে রাষ্ট্রপতিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্মতি দিতে হয়। উল্লেখ্য যে, ভারতের সংবিধানে সে দেশের পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিলে সম্মতি দেয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি।[৪৪] এ দিক থেকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভারতের পার্লামেন্টের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত এবং দুস্পরিবর্তনীয়। জাতীয় সংসদের ক্ষমতার উৎস হলো এই সংবিধান। প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত; কিন্তু সংবিধানের বিধানবলী সাপেক্ষে সংসদ এই আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করবে [অনুচ্ছেদ ৬৫ (১)]। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সংবিধান জনগনের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি এবং ইহা প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। অর্থাৎ সকল ক্ষমতা সংবিধান অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে। কোনো আইন যদি সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য হয়, তাহলে সেই আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য কোনো আইন বা তার কোনো অংশ বাতিল বলে গন্য হবে (অনুচ্ছেদঃ ২৬)। অর্থাৎ সংসদ সংবিধানের পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করলে সুপ্রীম কোর্ট তা অবৈধ বলে ঘোষনা করতে পারে। এই দিক দিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্ট অপেক্ষা মার্কিন কংগ্রেসের সাথে জাতীয় সংসদের অধিক সাদৃশ্য রয়েছে।[৪৫]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ মার্কিন কংগ্রেসের ন্যায় অসার্বভৌম আইনসভা হলেও তার ওপর বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রন তত ব্যাপক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচলিত "যথাবিহিত প্রণালী" (Due Process of Law)। নীতি অনুসারে শুধু যে সংবিধানের সীমা লংঘন করেছে বলে সুপ্রীম কোর্ট কোনো আইনকে বাতিল করতে পারে তা নয়, উপরন্তু মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত কোনো আইন সাধারণ ন্যায়নীতির পরিপন্থী হলেও অবৈধ ঘোষনা করতে পারে। এ ধরণের সুদূর প্রসারী ক্ষমতা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের নেই। মৌলিক অধিকারের ওপর কি ধরণের বাধা নিষেধ আরোপ করা যাবে সংবিধানে তার উল্লেখ আছে, অতএব আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ যুক্তি সঙ্গত কিনা আদালত শুধু তাই বিচার করে।[৪৬]

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে মার্কিন কংগ্রেস ও ভারতের পার্লামেন্টের তুলনায় বাংলাদেশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা অধিক। মার্কিন কংগ্রেস এককভাবে সংবিধান সংশোধন করতে পারে না। কংগ্রেসের উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত সংশোধনী প্রস্তাব তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গ রাজ্য কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা কার্যকর হয় না। ভারতেও সংবিধানের কতগুলো বিষয় সংশোধন করতে হলে পার্লামেন্টের অনুমোদন থাকলেই চলবে না, রাজ্যগুলোর আইনসভার অন্তত অর্ধেকের সমর্থন থাকা প্রয়োজন। অপর পক্ষে বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধন বা রহিত করা যায় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে, বিচারকদের অপসারণ করার ক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে জাতীয় সংসদের এক বিশেষ ক্ষমতা থাকলেও চতুর্থ সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি সেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে ও পঞ্চম সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি "সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের" সুপারিশক্রমে বিচারকদের অপসারণ করবেন। এরূপ ক্ষেত্রে পঞ্চম সংশোধনীই দ্বাদশ সংশোধনীতে বহাল থাকে। সুতরাং মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ সিনেট বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষেত্রে যে অধিকার ভোগ করে বাংলাদেশ পার্লামেন্ট সে অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আইনসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন না, কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সংসদীয় সরকারের সময় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে এবং একদলীয় ও বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসনামলে রাষ্ট্রপতি সেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন সময় আইনসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। এ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পার্লামেন্ট মার্কিন কংগ্রেসের তুলনায় কম ক্ষমতা ভোগ করে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হলেও তা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থা জনগনের অপ্রত্যাশিত একদলীয় ও বহুদলীয় রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থা ব্যতীত বাংলাদেশে বৃটেনের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এখানে শাসনবিভাগ তার সকল কাজ ও নীতির জন্য সংসদের নিকট দায়ী। সংসদের আস্থা হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। অবশ্য মন্ত্রীসভা পদত্যাগ না করে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংসদ গঠন করতে হয় এবং এই নতুন সংসদে মন্ত্রীসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে মন্ত্রীসভাকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে এবং যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে তারা নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করবে। বর্তমান সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিধান করা হয় যে, উল্লেখিত অবস্থা ছাড়াও সংসদের মেয়াদ শেষ হবার পর ক্ষমতাসীন দল সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিবে এবং এ সরকার নতুন মন্ত্রিসভা গঠন একই নিয়মে সমাধান করবে। তাছাড়া সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে রাষ্ট্রপতি, নির্বাচন কমিশনার, সরকারী কর্মকমিশনের সভাপতিকেও অপসারন করতে পারে। বস্তুত: ইহা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশ পার্লামেন্ট রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হয়েও সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১। **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান**, অনুচ্ছেদ- ১২২।

২। **প্রাগুক্ত** অনুচ্ছেদ- ৬৬।

৩। **প্রাগুক্ত**, ঢাকা, ১৯৯৮, অনুচ্ছেদঃ ৭২ (৩), (৪)।

৪। জালাল ফিরোজ, **পার্লামেন্টারী শব্দকোষ**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৮, পৃষ্ঠাঃ ১৮৭।

৫। **সংবিধান**, ১৯৯৮, অনুচ্ছেদঃ ৭৪ (১), (২)।

৬। **প্রাগুক্ত** অনুচেছদঃ ৭৪(৩)।

৭। **প্রাগুক্ত** অনুচ্ছেদঃ ৫৪।

৮। জালাল ফিরোজ, **প্রাগুক্ত**, পৃষ্ঠাঃ১৮৭।

৯। সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামানিক, **নির্বাচিত আধুনিক শাসন ব্যবস্থা**, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, জুলাই ১৯৮০, পৃষ্ঠাঃ ১৩০।

১০। Thomas R. Dye **Governing The American Democracy**, New York, 1980, PP. 278-279.

১১। **সংবিধান**, ১৯৯৮, অনুচ্ছেদঃ ৭৫(১)(খ)।

১২। **প্রাগুক্ত**, অনুচ্ছেদঃ ৭৮ (২)।

১৩। **প্রাগুক্ত**, অনুচ্ছেদঃ ৮৮(খ)(অ)।

১৪। **সংবিধান**, ১৯৯৮, অনুচ্ছেদঃ ৭৫(১)(ক)।

১৫। ঐ, অনুচ্ছেদঃ ৭২(১)(২)।

১৬। ঐ, অনুচ্ছেদঃ ৭৫(২)।

১৭। ঐ, অনুচ্ছেদঃ ৭৮(১-৪)

১৮। **কার্যপ্রণালী বিধি** ১৯৯৭, বিধিঃ ২৪(১-৩), ২৫ পৃষ্ঠাঃ ১১।

১৯। ঐ, বিধিঃ ৭২, ৭৪, ৭৫, পৃষ্ঠাঃ ৩১-৩২।

২০। ঐ, বিধিঃ ৭৬, পৃষ্ঠাঃ ৩২।

২১। ঐ, বিধিঃ ৭৭,৭৮ পৃষ্ঠাঃ ৩৩।

২২। ঐ, বিধিঃ ৮৪, পৃষ্ঠাঃ ৩৬-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৩। ঐ, বিধিঃ ৮০, পৃষ্ঠাঃ ৩৪-৩৫।

২৪। ঐ, বিধিঃ ৮৮, পৃষ্ঠাঃ ৩৭-৩৮।

২৫। ঐ, বিধিঃ ৯০-৯৬, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯।

২৬। সংবিধান, অনুচ্ছেদঃ ৮০(৪)।

২৭। সংবিধান, অনুচ্ছেদঃ ৮০।

২৮। E.C.S. Wade and Godfred Philips, **Constitutional Law**, London, 1953, P. 136.

২৯। সংবিধান, ঢাকা, ১৯৭৫, অনুচ্ছেদ ৬৫, ৮০।

৩০। সংবিধান, ঢাকা, ১৯৭৫, ১৯৯৯, অনুচ্ছেদঃ ৮৩, ৮৯(১)(২)(৩), ৮৭(১)।

৩১। E.C.S. Wade and Godfred Philips, **Ibid**, P. 105, Durga Dus Basu **Ibid**, PP. 259-265.

৩২। সংবিধান, ১৯৭৫, অনুচ্ছেদঃ ৮৩।

৩৩। সংবিধান, ঢাকা, ১৯৭৯ অনুচ্ছেদঃ ৯৫(ক)।

৩৪। সংবিধান, ঢাকা-১৯৯৯ অনুচ্ছেদঃ ৫৫(১)(৩) ৫৬(২)।

৩৫। E.C.S. Wade and Godfred Philips **Ibid**, PP. 140-150, Durga Das Basu, **Ibid**, P. 530.

৩৬। সংবিধান, ১৯৭৫, অনুচ্ছেদঃ ৫৮।

৩৭। সংবিধান, ১৯৯৯, ১৯৭৩, অনুচ্ছেদ, ৫২(১)(২), ৫৩(১) ও ১১৮(৫)।

৩৮। সংবিধান, ১৯৯৯, অনুচ্ছেদঃ ৯৬।

৩৯। Durga Dus Basu, **Ibid** P. 265.

৪০। সংবিধান, ১৯৭৫, অনুচ্ছেদঃ ৫৩।

৪১। সংবিধান, ১৯৭৩, ১৯৯৯-অনুচ্ছেদঃ ১৪২।

৪২। সংবিধান, ১৯৭৯, অনুচ্ছেদঃ ১৪২।

৪৩। আবুল ফজল হক, **প্রাগুক্ত**, পৃষ্ঠাঃ ২০৪-২০৫।

৪৪। Durga Das Basu, **Ibid**, Section: 3, P. 259.

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। আবুল ফজল হক, **প্রাগুক্ত**, পৃষ্ঠা: ২০৫-২০৬।

৪৬। আবুল ফজল হক, **প্রাগুক্ত**, পৃষ্ঠা: ২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৩

জাতীয় সংসদ ও সাংসদদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

Socio-Economic and Political Background of the Jatio Sangsad and the Jatio Sangsad Members

রাষ্ট্রকে জীব দেহের সাথে তুলনা করে রাষ্ট্রের জনগণ যদি হয় রাষ্ট্রের প্রান তবে পার্লামেন্টকেও দেহের সাথে তুলনা করলে পার্লামেন্টের সদস্যরা হবেন ইহার প্রান। প্রান ছাড়া দেহের যেমন কোনো মূল্য নেই তদ্রুপ সংসদ সদস্য ছাড়া পার্লামেন্টের কোন মূল্য নেই পার্লামেন্টের সুষ্ঠু কার্যকারিতা অনেকাংশ নির্ভর করে সাংসদদের রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার ওপর। তাই কোনো সংসদের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে গেলে সংসদ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সুক্ষভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এর মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগণের সাথে সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে পরিচয় হবে। যে পরিচয়ের সুত্র ধরে সংসদ সদস্যদের জনগণের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আর এই সম্পর্কই জনগণকে রাজনীতিতে অংশগ্রহনের প্রেরণা দিবে। তাছাড়া একটি দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিমন্ডলও সংসদের কার্যকারিতার ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে। তাই নির্বাচন ও একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেশে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্দেশ্য, কর্মসূচী, রাজনৈতিক কৌশল এবং বিশেষ করে সংসদীয় রাজনীতির প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অধ্যায়ন করা আবশ্যক।

সুতরাং এ অধ্যায়ে পঞ্চম সংসদ নির্বাচন, পার্লামেন্টের রাজনৈতিক গঠন, সাংসদদের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী আদর্শ ও কর্মসূচী

Election Idealogy and Programmes of the Political Parties

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই সকল নির্বাচনের সময় কতগুলো আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার ব্যক্ত করে। উদ্দেশ্যের যেগুলো তারা নির্বাচিত হবার পর বাস্তবায়ন করবে বলে জনগনের মাঝে প্রচার চালায়, মূলত: এই আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই কোনো একটি দলকে জনগনের কাছে পরিচিত করায় এবং সমর্থনের ভিত্তি গড়ে তোলে। অপরদিকে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাফল্য অধিকাংশ নির্ভর করে সেই ব্যবস্থার প্রতি বিদ্যমান রাজনৈতিক দলসমূহের অঙ্গীকারের ওপর। পঞ্চম পার্লামেন্ট ছিলো একটি সংসদীয় সরকার এবং এরূপ সরকারের ক্রিয়াশীল দলসমূহের একটি বড় অংশ যদি সংসদীয় রাজনীতির প্রতি আস্থাশীল না হয়, তাহলে সংসদ কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হবে। সুতরাং পঞ্চম পার্লামেন্টের আমলে সক্রিয় রাজনৈতিক দলসমূহের মতাদর্শ, বিশেষ করে সংসদীয় রাজনীতির প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, রণকৌশল এবং মতাদর্শের কি মিল ছিল তা আলোচনা করবো।

পঞ্চম পার্লামেন্ট নির্বাচনে সর্বমোট ৭৬টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। তবে এদের অধিকাংশ দলই ছিলো নামে মাত্র। মাত্র ১২টি দল নির্বাচনে আসন পেতে সক্ষম হয়। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইস্তেহার নিম্নে আলোচনা করা হলো।

আওয়ামী লীগ

Awami League

১৯৯১ এর ৬ ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইস্তেহারে বলা হয়, চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বাবস্থায় ১৯৭২ সালের সংবিধান পূর্নবহালের মাধ্যমে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও অঙ্গীকার।

নির্বাচনী ইস্তেহারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ও সংবিধানে গৃহীত চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ভিত্তিতে এক শোষনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, বাঙ্গালী জাতির আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং বাংলাদেশের ভূ-খন্ডে বসবাসরত সকল ধর্ম, বর্ণ,

Dhaka University Institutional Repository

গোত্র, জাতি-উপজাতির ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় নীতি ও সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান করা। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠাই এর মূল লক্ষ্য।

ইস্তেহারে বলা হয়, অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে সহায়কের নিয়ন্ত্রক নহে, এই নীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের দক্ষ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারী খাতের স্বাধীন ও স্বত:স্ফূর্ত উদ্যোগকে সর্বাত্মকভাবে উৎসাহিত এবং কোনো ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করন না করা; ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ, পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ, দশ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণের সুদ মওকুফ ও ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকের উৎপাদিত পন্যের যুক্তিসংগত মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান; সরকারী বেসরকারী খাতের শ্রমিকদের শ্রম সংগঠনের অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিক মালিক ও অন্যান্য প্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মজুরী নির্ধারণ; শিক্ষার সুযোগ প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার, এই নীতিতে শিক্ষার উন্নয়ন; সরকারী কর্মকর্তাগন প্রজাতন্ত্রে কর্মচারী, সরকারের নহে, এই নীতিতে প্রশাসন যন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা এবং দেশকে বহি:শত্রুর হাত হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি সুদক্ষ, শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল, কার্যকর ও নিরপেক্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। সাংবিধানিক অনুশাসন অনুযায়ী নিশ্চিত করার দলীয় নীতি ও লক্ষ্যের কথাও ইস্তেহারে ঘোষনা করা হয়। ইস্তেহারে আরো বলা হয়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের পর হতে দীর্ঘ ও নিরবিচ্ছিন্ন এক নায়কত্বের কুফল হিসেবে সমাজ জীবনে বিস্তৃত দুর্নীতির মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও প্রশাসনিক পর্যায়ে দুর্নীতিবাজ ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে চরম শাস্তির ব্যবস্থা এবং আর যাতে কোনো রাষ্ট্রপতিকে উচ্চাবিলাষী সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হতে না হয় এবং ক্ষমতার পরিবর্তন কেবল সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হয় সেই লক্ষ্যে খুন বা হত্যার মাধ্যমে নয় বরং সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনের মাধ্যমে খুনীদের সংবিধানের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করা হবে।[১]

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি)

Bangladesh Nationalist Party- B.N.P

বি. এন. পি. ২৮ জানুয়ারী, ১৯৯১ দলীয় নির্বাচনী ঘোষনাপত্রে দুর্নীতিমুক্ত, সৎ সরকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এই লক্ষ্যে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচীর আলোকে জনগণের পাঁচটি

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক চাহিদা পূরনের পদক্ষেপ গ্রহনের কথা বলা হয়। ঘোষনাপত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধানের চার মৌলনীতি বাস্তবায়নের কথা বলা হয়। চার মৌলনীতি হলো: সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর বিশ্বাস, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচারের সমাজতন্ত্র। ঘোষনাপত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা, সর্বপ্রকার কালাকানুন বাতিল করে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।

বহুদলীয় গণতন্ত্র নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ঘোষনাপত্রে বলা হয়, সকল দল ও মতের স্ব-স্ব মতাদর্শ প্রচারের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, বিদেশী আগ্রাসনের হাত হতে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুদক্ষ, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করা এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষকদের ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ ও সুদ মওকুফ করা হবে।[২]

পাঁচ দলীয় ঐক্য জোট

Five-Party Alliance

১৯৯১ সালের ৩১ জানুয়ারী ঘোষিত নির্বাচনী ইস্তেহারে পাঁচদলীয় জোট প্রথম ও তৃতীয় সংশোধনী ব্যতীত সংবিধানের সকল সংশোধনী বাতিল, অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী ধারা পরিহার এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের সহযোগীদের বিচারে নতুন আইন প্রণয়নের অঙ্গীকার করে ভোটের নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষণা করে।

উক্ত নির্বাচনী ইস্তেহারে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বীকৃত শ্রেণী ও পেশার দাবীসমূহ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে। পাঁচ দল এই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের অংশ হিসেবে নির্বাচনকে বিবেচনা করে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য অর্জনে তারা সংসদের ভিতরে ও বাহিরে সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। স্বৈরাচার সাম্প্রদায়িকতা ও সকল প্রকার শোষণ, নিপীড়ন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের বাঁচার আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। শোষক শ্রেণীর আগমন প্রতিরোধ করা, জনগনের আন্দোলনকে সংসদের ভিতরে নিয়ে যাওয়া। জনগণের বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মপালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, জরুরী অবস্থা জারীর বিশেষ ক্ষমতা আইন ও প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্ট, বিনাবিচারে আটক করার আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল করা হবে এবং রেডিও টেলিভিশন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করা

Dhaka University Institutional Repository

হবে। এরশাদ ও তাঁর সহযোগীদের দুর্নীতির বিচারের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করা হবে। পুলিশের অত্যাচার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নতুন পুলিশকোড প্রণয়ন এবং সেনাবাহিনীর গঠন কাঠামো ও বিধি ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আনা হবে। অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়নের লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো হবে এবং পুঁজিবাদী ধারা পরিহার করা হবে।

এছাড়া ব্যাংক বীমা ভারী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে রেখে এ যাবৎকালে অনুসৃত বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি বাতিল এবং বেসরকারী খাতের লুটপাটের ধারা পরিহার করে প্রকৃত শিল্প উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে। সেই সঙ্গে চোরাচালানী, মজুতকারী, বিদেশে সম্পদ পাঁচার কঠিন হস্তে দমন করা হবে। সামরিক খাত পুলিশ ও আমলাদের খরচ যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে। আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন মাল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। "খোদ কৃষকের হাতে জমি ও সমবায়" এই নীতিতে এক ফসলী জমি ৫০ বিঘা ও দু'ফসলী জমি ৩০ বিঘা পর্যন্ত সিলিং নির্ধারণ করে ভূমি সংস্কার বর্গা চাষীদের স্থায়ীভাবে চাষ করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ কৃষি উপকরণের দাম শতকরা ৫০ ভাগ কমানো হবে। এছাড়াও বেকার ভাতা প্রদান, জাতীয় বেতন স্কেলের অনুপাত ৫ঃ১ ধার্য করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ও দশম শ্রেনী পর্যন্ত অবৈতনিক করা হবে এবং অপসংস্কৃতি, বিকৃত পত্রিকা-পুস্তক, ব্লু-ফ্লিম বন্ধ করা হবে। সকল মানুষের জন্য অভিন্ন স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন ও কার্যকর, জাতিসংঘে "নারীর সমঅধিকার সনদ" কার্যকর কঠোর হস্তে নারী নির্যাতন বন্ধ ও শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হবে।

দলীয় ইস্তেহারে আরও বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসন প্রদান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ভূমিকার বিরোধিতাসহ সৌদি আরব হতে বাংলাদেশী সৈন্য ফিরিয়ে আনা হবে।[৩]

জামাত-ই-ইসলামী

Jamaat-i-Islami

১৯৯১ সালের ২৯ জানুয়ারী ঘোষিত জামাত-ই-ইসলামীর নির্বাচনী ইস্তেহারে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা, সকল কালাকানুন বাতিল ও সংবিধানের অনৈসলামিক অংশের সংশোধন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা, প্রশাসন ও আমলাতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে সৎ ও সুদক্ষ করে গড়ে

Dhaka University Institutional Repository

তোলার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এতে ছেলে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

সরকারের ধরণ সম্পর্কে নির্বাচনী ইস্তেহারে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রবর্তণের কথা বলা হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি প্রবর্তণের ওয়াদা ব্যক্ত করা হয়। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরন, বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মান মর্যাদা ও অবস্থান বৃদ্ধি বিশেষ করে মুসলীম ও প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব সুলভ সুসম্পর্ক দৃঢ় করার কথা এতে ব্যক্ত করার কথা বলা হয়।[৪]

ফ্রিডম পার্টি

ফ্রিডম পার্টির নির্বাচনী ইস্তেহারে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো ছিলো দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সম্বলিত নতুন সংবিধান প্রণয়ন, উচ্চকক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রবর্তন, সকল কালাকানুন ও ভারতের সাথে পঁচিশ বছর চুক্তি বাতিল, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবিধানের আদর্শের আলোকে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, বৈদেশিক নির্ভরতা হ্রাস ও বেকার সমস্যার সমাধান।[৫]

ন্যাপ (মোজাফফর)

ন্যাপ(মোজাফফর) এর নির্বাচনী ইস্তেহারে ধর্মসহ সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন, দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্ট ইত্যাদি বাতিলের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এতে ফারাক্কা, তিন বিঘা, তালপট্টি, বেরুবাড়ী সমস্যাসহ ভারতের সাথে সকল বিরোধ সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।[৬]

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)

Bangladesh Krishak Sramik Awami League (BAKSAL)

বাকশালের নির্বাচনী ইস্তেহারে বুলেটের রাজনীতি বন্ধ ও চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসহ ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবনের ওয়াদা করা হয়। এতে ফারাক্কার বিরুপ প্রতিক্রিয়া থেকে উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।[৭] অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ উপদেষ্টা পরিষদে সদস্য নিয়োগের জন্য তিন জোটের নিকট থেকে পৃথকভাবে নামের তালিকা আহ্বান করেন। তিন জোট কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রায় পাঁচ ডজন নামের মধ্য থেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পাঁচ দফায় মোট ১৭জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন; এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা দেয়া হয়। রাজনৈতিক জোট বা দল কর্তৃক মনোনীত হলেও

Dhaka University Institutional Repository

উপদেষ্টাগন কোন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না এবং তাদের অধিকাংশই ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বেসামরিক আমলা। অবশ্য সতের জনের মধ্যে একজন ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক আমলা, চারজন অধ্যাপক (যাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন প্রাক্তন উপাচার্য), একজন ডাক্তার, একজন প্রাক্তন বিচারপতি ও একজন আইনজীবি।[৮] নিম্নের সারণীতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদ প্রদর্শিত হলো (দেখুন সারণী ৩.১)।

সারণী ঃ ৩.১

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদ

নাম	মন্ত্রণালয়
১. বিচারপতি এম, এ খালেক	আইন, বিচার ও সংসদীয় বিষয়ক
২. জনাব কফিল উদ্দীন মাহমুদ	অর্থ
৩. জনাব ফখরউদ্দীন আহমদ	পররাষ্ট্র
৪. অধ্যাপক রেহমান সোবহান	পরিকল্পনা
৫. অধ্যাপক ওয়াহিদুদ্দীন আহমদ	জ্বালানী, খনিজ এবং পূর্তকর্ম
৬. অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	শিক্ষা
৭. জনাব আলমগীর এম. এ. কবীর	সমাজকল্যান, মহিলা বিষয়ক এবং যুব উন্নয়ন ও ক্রীড়া
৮. জনাব এ. কে. এম. মুসা	শিল্প, পাট এবং বস্ত্র
৯. জনাব ফজলুর রহমান	সেচ পরিবেশ, বন, মৎস ও পশু সম্পদ
১০. এম. এ. মাজেদ	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
১১. মেজর অবঃ রফিকুল ইসলাম	জাহাজ, নৌচলাচল এবং পর্যটন
১২. অধ্যাপক ইয়াজউদ্দীন আহমদ	সংস্কৃতি ও খাদ্য
১৩. জনাব এ. বি. এম. জি. কিবরিয়া	যোগাযোগ ও টেলিযোগাযোগ
১৪. জনাব ইমানউদ্দীন আহমেদ	বানিজ্য
১৫. জনাব বি. কে. দাস	ত্রান ও পুনর্বাসন
১৬. জনাব এম. আনিসুজ্জামান	কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা
১৭. চৌধুরী এম. এ. আমিনুল হক	শ্রম জনশক্তি এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ

Dhaka University Institutional Repository

উৎসঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ঢাকা, জুন- ১৯৯৪, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৪।

তিন জোটের যৌথ ঘোষণার অন্যতম দাবি ছিলো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করা। তদনুসারে ৮ ও ৫ দলীয় জোট এরশাদ কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের দাবী জানায়। এতে ৭ দলীয় জোট তথা বি. এন. পি. প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে তিন জোটের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আব্দুর রউফকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিচারপতি মেসবাহ উদ্দীনকে নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করে কমিশন পুনর্গঠিত করেন।[৯]

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয়ের পর ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[১০] বহুমুখী ও বহুমাত্রিক গুরুত্বের কারণে বাংলাদেশের ও বহি:বিশ্বের জনগন অত্যন্ত আগ্রহ ও কৌতুহল ভরে এ নির্বাচনের জন্য অপেক্ষায় ছিলো।

নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটারগন কর্তৃক ভোটাধিকার প্রয়োগ গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় শাসন করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন বিশ্বের এ অঞ্চলে কখনো স্বাভাবিক ঘটনা ছিলো না। সাধারণত: অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়েই বৃটিশ আমলে এবং স্বাধীনতার পূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তরকালে শাসক গোষ্ঠী অনেকটা অনিচ্ছাকৃতভাবে ও ঈর্ষান্বিত ভাবেই নির্বাচন দেয়।[১১] এখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার চেয়ে ক্ষমতা বৈধকরণের উপায় হিসেবেই নির্বাচনের অভিনয় করা হয়। ফলে তৃতীয় বিশ্বের ও উন্নয়নশীল যেকোন দেশের তুলনায় এখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। গণতন্ত্রের এরূপ আত্মতৃপ্তিকর ও অনিয়মিত চর্চা খাটি ও মজবুত গণতান্ত্রিক ভিত্তির বিকাশে খুব একটা সহায়ক হয়নি।[১২] নির্বাচন স্বয়ং গণতন্ত্র না হলেও এ লক্ষ্যে এটাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দুভার্গ্যবশত: স্বাধীনতার উনিশ বছরের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠাগুলোর মূল গভীরে তা প্রোথিত হয়নি। কিন্তু ১৯৯১ সালে সংসদ নির্বাচন এক ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও পটভূমিতে অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ক্ষমতার বৈধকরণ কিংবা শাসকদের হাত বদল কোনটাই ছিল না। বরং তা ছিলো জাতির ভবিষ্যত ভাগ্য কি হবে তা নির্ধারণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে দলীয় অবস্থান (১৯৯১-১৯৯৬)

Political Position of the Parties in the Jatio Sangsad (1991-1996)

পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট ৬,২২,৮৯,৫৫৬ জন ভোটারের মধ্যে শতকরা ৩৫-৫৫টি ভোট প্রদত্ত হয়। ৪২৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ নির্বাচনে অংশ নেয় মোট ২,৭৮৭ জন প্রার্থী। সর্বমোট ৭৬টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নেয়। প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে ২টি আসনে নির্বাচন স্থগিত থাকে। চারজন প্রার্থী একাধিক আসনে জয়লাভ করে। নির্বাচনী সংঘর্ষের কারণেও তিনটি আসনের আংশিক নির্বাচন স্থগিত থাকে। সব মিলিয়ে পরবর্তীতে ১১টি আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও পরোক্ষভাবে ৩০ জন মহিলা সদস্য সংসদ সদস্যদের পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়।[১০] পঞ্চম সংসদ নির্বাচন, ভোটদাতা, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল এসব দিক থেকে পূর্ববর্তী সকল নির্বাচন থেকে ভিন্ন ছিল। নিচের সারণীতে তা প্রদর্শিত হলো (সারণী ৩.২)।

সারণী ঃ ৩.২

১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮ ও ১৯৯১ এর নির্বাচনে অংশগ্রহনকৃত ভোটার, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের তুলনামূলক চিত্র।

নির্বাচনের বছর	ভোটারের সংখ্যা	প্রার্থীর সংখ্যা	রাজনৈতিক দলের সংখ্যা
১৯৭৩	৩,৫২,০৫,৬৪২	১০৮৯	১৪
১৯৭৯	৩,৮৩,৬৩,৮৫৮	২১২৫	২৯
১৯৮৬	৪,৭৩,১৫,৮৮৬	১৫২৭	২৮
১৯৮৮	৪,৯৮,৬৩,৮২৯	৯৭৮	৮
১৯৯১	৬,২২,৮৯,৫৫৬	২৭৮৭	৭৬

উৎসঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা।

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণে বিজয়ী দল, প্রত্যেকটি দলের মোট প্রার্থী, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা এবং প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার নিম্নের সারণীতে দেয়া হলো (সারণী ৩.৩)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৩.৩

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফলঃ দলীয় অবস্থান (বিজয়ী আসনের)

দলের নাম	মোট প্রার্থী	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতকরা হার)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি.)	৩০০	১৪০	৩০.৮১
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৪	৮৮	৩০.০৮
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ	৬৮	০৫	১.৮১
বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি	৪৯	০৫	১.৯১
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	৩১	০১	০.৭৬
গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	০১	০.৪৫
জনতা মুক্তি পার্টি	০৮	--	০.০৯
জামাত-ই-ইসলামী	২২২	১৮	১২.১৩
জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫	১১.৯২
ইসলামী ঐক্যজোট	৫৯	০১	০.৭৯
জাকের পার্টি	২৫১	--	১.২২
খেলাফত আন্দোলন	৪৩	--	০.২৭
জাসদ রব	১৬১	--	০.৭৯
জাসদ সিরাজ	৩১	০১	০.২৫
জাসদ ইনু	৬৮	--	০.৫০
ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	০১	০.১৯
বাসদ (খালেকুজ্জামান)	১৩	--	০.১০
বাসদ মাহবুব	০৬	--	০.০৪
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	০৩	--	০.০২
ইউনাইটেড কম্যুনিষ্ট লীগ	২৬	--	০.৩২

Dhaka University Institutional Repository

দলের নাম	মোট প্রার্থী	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতকরা হার)
ঐক্য প্রক্রিয়া	০২	--	০.০৩
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২০	০১	০.৩৬
বাংলাদেশ জনতা দল	৫০	--	০.৩৫
ফ্রিডম পার্টি	৬৫	--	০.২৭
বাংলাদেশ মুসলীম লীগ (আয়েন উদ্দীন)	০৬	--	০.২০
বাংলাদেশ মুসলীম লীগ (কাদের)	৬২	--	০.১০
বাংলাদেশ মুসলীম লীগ (মতিন)	০৬	--	০.০৩
বাংলাদেশ মুসলীম লীগ (ইউসুফ)	০৮	--	০.০১
অন্যান্য দল	২১৮	--	০.৫৩
স্বতন্ত্র	৪২৪	০৩	৪.৩৯
সর্বমোট	২৭৮৭	৩০০	১০০

উৎসঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, ৭০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে কেবল ১২টি দল বিভিন্ন সংখ্যক আসন লাভ করে। বি. এন. পি. সর্বোচ্চ ১৪০টি আসন পায়, আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থান ও ছয়টি রাজনৈতিক দল প্রত্যেকে সর্বনিম্ন একটি করে আসন পায়। লক্ষ্য করা যায় ২৭ ফেব্রুয়ারীর সাধারণ নির্বাচনে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তবে বিএনপি ১৪০টি আসন নিয়ে সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং এই দল সরকার গঠনের দাবী জানায় কিন্তু অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষনে বলেন, নির্বাচিত সদস্যদের দলগত অবস্থান থেকে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠের আশাভাজন তা স্পষ্ট নয় বিধায় এ মুহূর্তে মন্ত্রীপরিষদ গঠন সম্ভব নয়। অবশেষে জামাত বি.এন.পিকে সমর্থনের লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯মার্চ, ১৯৯১ তারিখে বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি ৩০ সদস্যের মন্ত্রি পরিষদ গঠন করা হয়। উল্লেখ যে সংবিধান অনুযায়ী সকল নির্বাহী ক্ষমতা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে থেকে যায়। আইনত: প্রধানমন্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

ও অন্যান্য মন্ত্রীরা ছিলেন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মাত্র। ১৯৯১ সালের ৬ আগষ্ট দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস এবং ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৯১-এ সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এক্ষেত্রে উক্ত সময়ের শাসনকে দ্বৈত শাসন বলা যেতে পারে। কেননা বেগম খালেদা জিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সকল নির্বাহী ক্ষমতা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে থেকে যায়।

স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬ এবং ১৯৯১ -এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটারের একটি তুলনায় দেখা যায় যে, ১৯৭৩ -এর নির্বাচনে ৫৫%, ১৯৭৯ সালে ৫৩.৫৯%, ১৯৮৬ সালে ৫৬.৫৫% এবং ১৯৯১ -এর নির্বাচনে ৫৫.৩৫% ভোটার ভোট দেয়।[১৪] তাহলে দেখা যাচ্ছে তুলনামূলকভাবে ভোটারের পরিমান তেমন বৃদ্ধিও পায়নি এবং কমেওনি।

সাংসদদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

Socio Economic and Political Background of the Jatio Sangsad Members

পঞ্চম সংসদের সাংসদদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে একই সাথে অতীত সংসদীয় সরকারের একটি তুলনামূলক চিত্র সারণীর মাধ্যমে দেখানো হবে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপিত হবে এবং যা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিবে। আর যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাহলো সাংসদদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের ক্রমশ পরিবর্তনের একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠবে।

১. সদস্যদের বয়স

Age of the Jatio Sangsad Members

পঞ্চম জাতীয় সংসদে ৩৩০ জন সদস্যদের মধ্যে মহিলা সদস্যবাদে ৩০০ জন সাংসদদের মধ্যে বয়সের গ্রুপে দেখা যায় যে, ৫৬ বছর বয়সের উপরে সদস্য ছিলেন ৬২ জন, ৪৬-৫৫ বছর বয়সের গ্রুপে ছিলেন ১০১ জন, ৩৬-৪৫ বছর বয়সের গ্রুপে ছিলেন ১১৩ জন, ৩১-৩৫ বছর বয়সের গ্রুপে ছিলেন ২০ জন, ২০-৩০ বছর বয়সের গ্রুপে ছিলেন ৪ জন। পঞ্চম সংসদ সদস্যদের বয়স সারণীতে উপস্থাপন এবং সারণীতে প্রথম সংসদ সদস্যদের বয়স উল্লেখ করে একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৩.৪

প্রথম ('৭৩) ও পঞ্চম ('৯১) পার্লামেন্টে নির্বাচিত সংসদদের বয়সের তুলনামূলক চিত্র

বয়স	প্রথম পার্লামেন্ট			পঞ্চম পার্লামেন্ট		
	সংখ্যা	শতকরা হার		সংখ্যা	শতকরা হার	
৫৬ এর উর্ধ্বে	১৩	৫	২৬	৬২	২১	৫৫
৪৬-৫৫	৬১	২১		১০১	৩৪	
৩৬-৪৫	১১২	৪০	৭৪	১১৩	৩৮	৪৬
৩১-৩৫	৬৩	২৩		২০	৭	
২০-৩০	৩১	১১		৪	১	
মোট	২৮০	১০০		৩০০	১০১	

উৎসঃ "Table-2 Members of Parliament" in Ronaq Jahan, Bangladesh Politics: Problems and Issues, Dhaka: University Press Limited, 1980, P. 146, Talukder Maniruzzaman, The Fall of the Military Dictator: 1991 Elections and the Prospect of Civilian Rule in Bangladesh, See, The Journal of Pacific Affairs, Vol. 65, No. 2 Summer, 1992 P- 220.

উপর্যুক্ত, সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, বয়সের দিক থেকে প্রথম ও পঞ্চম পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম পার্লামেন্টে ৫৬ এর উপরে বয়সের সদস্য ছিলেন ১৩ জন (৫%) সেখানে পঞ্চম পার্লামেন্টে এরূপ সদস্য ছিলেন ৬২ জন (২১%)। তাছাড়া প্রথম সংসদে (৪৬-৫৫) বয়সের গ্রুপে ৬১ জন (২১%)। অপরদিকে পঞ্চম পার্লামেন্টে এই গ্রুপে ১০১ জন (৩৪%) সদস্য নির্বাচিত হন। তবে উভয় পার্লামেন্টেই (৩৬-৪৫) বছর বয়সের গ্রুপে সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশী এবং (২০-৩০) বছর বয়সের গ্রুপে সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে কম নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালে পার্লামেন্টে মনোনীত ৩০ জন মহিলা সদস্যদের (২৫-৩০) বছর বয়সের গ্রুপে একজন, (৩১-৩৫) বছর বয়সের গ্রুপে দু'জন (৩৬-৪০) বছর বয়সের গ্রুপে পাঁচ জন, (৪১-৪৫) বছর বয়সের গ্রুপে দু'জন (৪৬-৫০) বছর বয়সের গ্রুপে পাঁচজন (৫১-৫৫) বছর বয়সের গ্রুপে পাঁচ জন এবং ৫৬ বছর বয়সের উর্ধ্বে ছিল পাঁচ জন সদস্য।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

২. সদস্যদের শিক্ষার মান

Academic feat of the Jatio Sangsad Members

যেহেতু পার্লামেন্টের সদস্যরাই হলেন দেশের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অভিভাবক কাজেই একদিকে যেমন সকল সংসদ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা সমান নয়, অপরদিকে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জ্ঞান অর্জনে তাদের শিক্ষাগত মান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে সাংসদদের শিক্ষাগত মান সম্পর্কে অনুসন্ধান করা দরকার।

১৯৯১ সালে নির্বাচিত পঞ্চম পার্লামেন্টে সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতায় পোষ্টগ্রাজুয়েট ৯৬ জন (২৯.০৯%), গ্রাজুয়েট ১৫১ জন (৪৫.৭৬%), উচ্চ মাধ্যমিক ৩৫ জন (১০.৬১%), মাধ্যমিক ১১ জন (৩.৩৩%), মাধ্যমিকের নিচে ৪ জন (১.২১%), অন্যান্য ১০ জন (৩.০৩%), ২৩ জন (৬.৯৭%) সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা জানা সম্ভব হয়নি। নিম্নে পঞ্চম পার্লামেন্ট সাংসদদের শিক্ষাগত মানের সাথে প্রথম পার্লামেন্টের সাংসদদের তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শন করা হলো (দেখুন সারনী ৩.৫)।

সারণী ঃ ৩.৫

প্রথম ('৭৩) ও পঞ্চম ('৯১) সংসদে নির্বাচিত সাংসদদের শিক্ষাগত মানের তুলনামূলক চিত্র

শিক্ষাগত যোগ্যতা	প্রথম পার্লামেন্ট		পঞ্চম পার্লামেন্ট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
পোষ্ট গ্রাজুয়েট	৯০	২৮.৫৭%	৯৬	২৯.০৯%
গ্রাজুয়েট	১২৭	৪০.৩২%	১৫১	৪৫.৭৬%
উচ্চ মাধ্যমিক	২৮	৮.৮৯%	৩৫	১০.৬১%
মাধ্যমিক	৩৩	১০.৪৮%	১১	৩.৩৩%
মাধ্যমিকের নিচে	৬	১.৯০%	৪	১.২১%
• অন্যান্য	১৪	৪.৪৪%	১০	৩.০৩%
অজানা	১৭	৫.৪০%	২৩	৬.৯৭%
মোট	৩১৫	১০০%	৩৩০	১০০%

• অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ-সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত, ঢাকা, ১৯৭৫, মোস্তাফা হারুন (সম্পাদক) **Who's who in the Parliament**, সৌখিন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৯, আহমদ উল্লাহ (সম্পাদনা), **পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামান্য গ্রন্থ** (সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত), সূচয়ন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২।

উপর্যুক্ত সারণীর দিকে তাকালে আমরা প্রথম ও পঞ্চম পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে গড়ে শিক্ষাগত মানের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। যেমন, প্রথম পার্লামেন্টে যেখানে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছিলেন ৯০ জন সেখানে পঞ্চম পার্লামেন্টে এরূপ সদস্য ছিলেন ৯৬ জন, এভাবে প্রথম পার্লামেন্টে গ্রাজুয়েট ১২৭ জন, উচ্চ মাধ্যমিক ২৮ মাধ্যমিক ৩৩ জন মাধ্যমিকের নিচে ৬ জন, অন্যান্য ১৪ জন। অপরদিকে পঞ্চম পার্লামেন্টে গ্রাজুয়েট ১৫১ জন, উচ্চ মাধ্যমিক ৩৫ জন ,মাধ্যমিক ১১ জন, মাধ্যমিকের নিচে ৪ জন, অন্যান্য ১০ জন। তবে উভয় পার্লামেন্টেই গ্রাজুয়েট সদস্য সংখ্যা বেশী ছিল।

৩. সদস্যদের পেশা

Profession of the Jatio Sangsad Members

একটি দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণত: সে দেশের সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে। কারণ যেকোন পার্লামেন্টে বিভিন্ন পেশা ও স্বার্থগোষ্ঠীর ব্যক্তিরা সংসদ-সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসেন। আর এসব স্বার্থ গোষ্ঠীর সদস্যরা পার্লামেন্টে প্রায় সকল নীতি নির্ধারণের সময় নিজ নিজ গ্রুপের স্বার্থে সংসদকে প্রভাবিত করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে সংসদ-সদস্যদের পেশা, গোষ্ঠী ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। নিম্নে পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পেশাগত অবস্থান সারণীর মাধ্যমে দেখানো হলো (সারণী ঃ ৩.৬)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৩.৬

১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের পেশাগত অবস্থান

পেশা	সংখ্যা	মোট শতকরা হার
আইনজীবী	৫৬	১৯
ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি ক	১৬০	৫৩
সাবেক সেনা অফিসার খ	১৭	৬
কৃষিজীবী (Land Holders)	১২	৪
ডাক্তার	৮	৩
স্কুল এবং মাদ্রাসা শিক্ষক	১২	৪
বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ শিক্ষক	১৬	৫
ছাত্রনেতা	১	১
সাংবাদিক	৬	২
সাবেক সরকারী কর্মকর্তা	৬	২
সার্বক্ষনিক রাজনীতিবিদ গ	৬	২
মোট	৩০০	১০১

ক. ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪৩ জন ব্যবসায়ী এবং ১৭ জন শিল্পপতি।

খ. এখানে সবাই ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি।

গ. সার্বক্ষনিক রাজনীতিবিদদের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া এবং বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির (মস্কো পূর্ব) চার জন সদস্য যারা দলের রাজনীতিতে নিজেদেরকে সবসময় উৎসর্গ করেছেন। রাউন্ডিং এর কারণে মোট শতকরা হার অতিক্রম করেছে।

উৎসঃ Talukder Maniruzzaman, The Fall of the Military Dictator: 1991 Elections and the Prospect of Civilian Rule in Bangladesh, see: **The Journal of Pacific Affairs**, Vol. 65, No. 2, Summer 1992, P. 214

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত সারণীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যরাই ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি গোত্রের, যারা মোট সদস্যদের ৫৩% প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে মোট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অবস্থান ৫৯%, যেহেতু পূর্ববর্তী সামরিক অফিসারদেরও বর্তমানে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি হিসাবে গন্য করা হয়। অন্যান্য পেশাজীবি সম্প্রদায় হচ্ছে আইনজীবী, ডাক্তার, স্কুল শিক্ষক, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাংবাদিক, ছাত্রনেতা এবং অবসরপ্রাপ্ত রাজনৈতিক কর্মকর্তা। যারা এরশাদ শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৯০ এর অক্টোবর নভেম্বরের আন্দোলনে নেতৃত্বে দিয়েছেন, তাদের সংখ্যা বর্তমান সংসদে মাত্র ৩৬%।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো পরিস্কারভাবে আমরা ধারণা পেতে পারি যদি পূর্ববর্তী সংসদ সদস্যদের একটি তুলনামূলক চিত্র অংকন করি। নিম্নে ১৯৭৩ এবং ১৯৯১ এ নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পেশাগত অবস্থানের একটি তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো (সারণী ঃ ৩.৭)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৩.৭

১৯৭৩ এবং ১৯৯১ এ আইনসভায় নির্বাচিত সাংসদদের তুলনামূলক পেশাগত অবস্থান

পেশা	১৯৭৩		১৯৯১		
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	
আইনজীবী	৭৫	২৬	৫৬	১৯	
ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি	৬৭	২৪	১৬০	৫৩	৫৯
সাবেক সেনা অফিসার এখন ব্যবসায়ী। শিল্পপতি			১৭	৬	
কৃষিজীবী	৫০	১৮	১২	৪	
সাবেক বেসামরিক আমলা	২	১	৬	২	
ডাক্তার	১৫	৫	৮	৩	
অন্যান্য	২৮	১০	২৮	৯	
ধর্মীয় নেতা	-	-	-	-	
সাংবাদিক	-	-	৬	২	
সার্বক্ষনিক রাজনীতিবিদ	৩৫	১২	৬	২	
বিবিধ	১১	৪	১	১	
মোট	২৮৩	১০০	৩০০	১০১	

রাউন্ডিং এর কারণে মোট শতকরা হারকে অতিক্রম করেছে।

উৎস ঃ Talukder Maniruzzaman, "The Fall of the Military Dictator: 1991 Elections and the Prospect of civilian Rule in Bangladesh", **The Journal of Pacific Affairs** Vol. 65, No. 2, Summer, 1992, P- 214.

উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে ১৯৭৩ সালে আইনজীবীদের সংখ্যা ছিল ২৬% এবং ১৯৯১ সালে কমে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ১৯%। অন্যদিকে ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতির সংখ্যা ১৯৭৩ সালে যেখানে ছিল ২৪%

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে ১৯৯১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৯%। আবার কৃষিজীবী সদস্যদের সংখ্যা ১৯৭৩ সালে ছিল ১৮% এবং ১৯৯১ সালে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৪% এ।

৪. সাংসদদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা

Political experience of the Jatio Sangsad Members

পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় তারা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। ফলে সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে যে তথ্য বের হয়ে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, (০-৫) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি ২১ জন (৬.৩৬%), এরূপ পর্যায়ক্রমে (৬-১১) বছরের ১৫ জন (৪.৫৫%), (১২-১৭) বছরের ৩৮ জন (১১.৫২%), (১৮-২৩) বছরের ৫০ জন (১৫.১৫%), (২৪-২৯) বছরের ৬৭ জন (২০.৩০%), (৩০-৩৫) বছরের ৪৩ জন (১৩.০৩%), (৩৬-৪১) বছরের ২৮ জন (৮.৪৮%), (৪২-৪৭) বছরের ১৬ জন (৪.৮৫%), (৪৮-৫৩) বছরের ৪ জন (১.২১%), ৫৪ বছরের উর্ধ্বে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ৬ জন (১.৮২%) এবং ৪২ জন (১২.৩৩%) সাংসদদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

অভিজ্ঞতার দিক থেকে (২৪-২৯) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সদস্য সবচেয়ে বেশী ছিলেন। উল্লেখ্য যে, অভিজ্ঞ সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন বিরোধী দলের। নিম্নে পঞ্চম পার্লামেন্টের সাংসদদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার চিত্র দেয়া হলো (সারণী ঃ ৩.৮)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৩.৮

পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কাল	সংখ্যা	শতকরা হার
০-৫	২১	৬.৩৬%
৬-১১	১৫	৪.৫৫%
১২-১৭	৩৮	১১.৫২%
১৮-২৩	৫০	১৫.১৫%
২৪-২৯	৬৭	২০.৩০%
৩০-৩৫	৪৩	১৩.০৩%
৩৬-৪১	২৮	৮.৪৮%
৪২-৪৭	১৬	৪.৮৫%
৪৮-৫৩	৪	১.২১%
৫৪ এর উর্ধ্বে	৬	১.৮২%
• অজানা	৪২	১২.৭৩%
মোট	৩৩০	১০০%

উৎস ঃ আহমদ উল্লাহ (সম্পাদনা), **পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামান্য গ্রন্থ** (সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত), সূচয়ন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২।

৫. সাংসদদের সংসদীয় অভিজ্ঞতা।

Parliamentary experience of the Jatio Sangsad Members

যেকোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ সংসদ সদস্যরাই সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারেন। সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবেও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে। পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত ৩০০ জন সংসদ সদস্য ও মনোনীত ৩০ জন মহিলা সদস্যদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে, ৭০ জনের (২১.২১%) পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে পাঁচ বছরের, ৩৪ জনের (১০.৩০%) দশ বছরের, ১২ জনের (৩.৬৪%) পনেরো বছরের, ৬ জনের (১.৮২%) বিশ বছরের এবং ১ জনের (০.৩০%) ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা ছিলো। এ সংসদের ২০৪ জন (৬১.৮২%) সদস্যের সংসদীয় হিসেবে কোন অভিজ্ঞতা ছিলো না। ৩ জন সদস্যের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রথম পার্লামেন্ট সদস্যদের সাথে পঞ্চম পার্লামেন্ট

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের সংসদীয় অভিজ্ঞতার একটি তুলনামূলক আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, পঞ্চম পার্লামেন্টের সদস্যদের এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা কম ছিলো (দেখুন সারণী ৩.৯)।

সারণী ঃ ৩.৯

প্রথম ও পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের সংসদীয় অভিজ্ঞতার অবস্থান

অভিজ্ঞতার কাল	প্রথম পার্লামেন্ট	পঞ্চম পার্লামেন্ট
শূন্য	১২৭(৪০.৩৩%)	২০৪(৬১.৮২%)
পাঁচ বছর	১৬০(৫০.৭৯%)	৭০(২১.২১%)
১০ বছর	২৩(৭.৩০%)	৩৪(১০.৩০%)
১৫ বছর	৫(১.৫৮%)	১২(৩.৬৪%)
২০ বছর	--	৬(১.৮২%)
৩০ বছর *১	--	১(০.৩০%)
অজানা *২	--	৩(০.৯১%)
মোট	৩১৫ (১০০%)	৩৩০(১০০%)

*১. মিজানুর রহমান চৌধুরী (রংপুর - ৫)।

*২. মনোনীত মহিলা সদস্য।

উৎসঃ আহমদ উল্লাহ (সম্পাদনা), **পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামান্য গ্রন্থ** (সংসদ-সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত), সূচয়ন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ-সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত ঢাকা, ১৯৭৫, মোস্তফা হারুন (সম্পাদক), **Who's who in the parliament**, ঢাকা, সৌখিন প্রকাশনী ১৯৭৯।

উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে প্রথম পার্লামেন্টে ৩১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১২৭ (৪০.৩৩%) জনের অভিজ্ঞতা ছিলো না, সেখানে পঞ্চম পার্লামেন্টে ৩৩০ জন সদস্যের মধ্যে ২০৪ (৬১.৮২%) অভিজ্ঞতা ছিলো না। এ থেকে প্রমানিত হচ্ছে যে, সময় ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কম্পিউটার যুগের পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেলেও বাংলাদেশের পার্লামেন্ট অর্থাৎ জাতীয় সংসদের সাংগঠনিক উন্নয়ন ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এর পশ্চাতে অনেক কারণ রয়েছে। প্রথম পার্লামেন্টে ক্ষমতাসীন আওয়ামী

Dhaka University Institutional Repository

লীগ ছিলো একটি পুরাতন, ঐতিহ্যবাহী দল। দীর্ঘ সংগ্রাম পেরিয়ে দলটি ১৯৭১ সালে ক্ষমতায় আসে। সুতরাং প্রথম পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে সাধারণ দলীয় আনুগত্য বোধ ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছিলো। অপরদিকে, দলীয় নেতা নেত্রীদের রাজনৈতিক ও সংসদীয় অভিজ্ঞতা বিচার বিবেচনা করে নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হতো। তাই প্রথম পার্লামেন্টে সাংসদদের সংসদীয় অভিজ্ঞতা বেশী ছিলো। ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সামরিক শাসকগন 'বেসামরিকীকরণ' এর লক্ষ্যে তাদের নেতৃত্বে নতুন দল বি. এন. পি. ও জাতীয় পার্টি গঠন করেন। বহু অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক অফিসার এই সব দলে যোগদান করেন। তাছাড়া মন্ত্রীত্বসহ সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীরা এসব দলে যোগ দেন। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু নেতারা সুবিধাবাদী দলের ন্যায় যখন যে দলে সুবিধা পেয়েছেন তখন সেই দলে যোগ দিতে কুণ্ঠিত বোধ করেননি। বি. এন. পি ও জাতীয় পার্টির গঠনকাল ১২ ও ১৬ বছর অতিবাহিত হলেও পঞ্চম পার্লামেন্টে সদস্যদের রাজনৈতিক ও সংসদীয় অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ সংসদদের তুলনায় এ দু'দলের অভিজ্ঞতা কম। সাংসদদের পেশাগত বিশ্লেষণ থেকে এরূপ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে সকল দলীয় প্রধানরা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য তাদের মনোনীত প্রার্থীদের তালিকায় দলীয় নেতানেত্রীদের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব না দিয়ে যারা যত বিত্তশালী তাদেরই মনোনয়ন প্রদান করে থাকেন। ফলস্বরূপ প্রথম পার্লামেন্টে যেখানে ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি সদস্য সংখ্যা ২৪% সেখানে পঞ্চম পার্লামেন্টে এরূপ সংখ্যা ছিলো ৫৯%। প্রেক্ষাপটে পার্লামেন্টে সংসদীয় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে।

৬. বিভিন্ন দলের সাংসদদের রাজনৈতিক অতীত

পঞ্চম পার্লামেন্টে বিভিন্ন দলের সদস্যদের রাজনৈতিক অতীত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোন দলেরই সকল সদস্যরাই নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে একই দলের সদস্য নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের সদস্যরা নিজ নিজ সুবিধাভোগ কিংবা ভিন্ন দলের আদর্শকে অধিকতর গ্রহনযোগ্য মনে করে দল পরিবর্তন করেছে (দেখুন সারণী ঃ ৩.১০)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৩.১০

পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের রাজনৈতিক অতীত

পূর্বের রাজনৈতিক সম্পর্ক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	আওয়ামী লীগ	জাতীয় পার্টি	জামাত-ই-ইসলাম
আওয়ামী লীগ	২৫	৫৬	১৭	১
বি. এন. পি.	৪০	--	৩	--
জাতীয় পার্টি	--	--	৪	--
জামাত-ই-ইসলামী	১	--	--	১৬
ইউনিয়ন	২৪	৮	৫	--
মুসলীম লীগ	৯	৫	১	২
ন্যাপ (ভাসানী)	৮	১	১	--
ডেমোক্রেটিক লীগ	২	১	--	--
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২	--	১	--
স্বতন্ত্র	২	১	১	--
পূর্ব বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি	১	১	--	--
ছাত্র কংগ্রেস	--	১	--	--
যুক্তফ্রন্ট	--	--	--	১
জাতীয় লীগ	--	১	--	--
অরাজনৈতিক ব্যক্তি	১২	৪	--	--
*অন্যান্য	৬	--	--	--
অজানা	৩৭	৯	২	--

*অন্যান্য দল ও ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছিলো শ্রমিক ফেডারেশন, ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, ছাত্রশক্তি জাতীয় লীগ, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি।

উৎস ঃ আহমদ উল্লাহ (সম্পাদনা), **পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামান্য গ্রন্থ** (সংসদ-সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত), সূচয়ন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২।

সাংসদদের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কয়েক দশক পূর্বে এদেশের ব্যবসায়ী মহল ছিলেন রাজনীতির প্রশ্নে প্রায় নির্লিপ্ত। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ ব্যবসায়ীই রাজনীতিবিদদের সমর্থন ও সহযোগীতা করলেও সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত হতে আগ্রহী হতেন না।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি রাজনীতিবিদদের পেশাগত ব্যাপার বলেই তাঁরা মনে করতেন। অপরদিকে কৃষিজীবীদের রাজনীতির ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ ছিলো। আজ সংসদে তাদের অবস্থান বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এর মূলে টাকার কাছে হেরে যাচ্ছে যোগ্যতার মাপকাঠী। আর এই সুযোগ ক্রমশ দখল করে নিয়েছে ব্যবসায়ী শিল্পপতি গোষ্ঠী। জাতীয় স্বাধীনতার কারণে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে দ্রুত পরিবর্তণ হয়েছে তা আমাদের ব্যবসায়ীদের মন ও মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তণ আনতে সক্ষম হয়েছে। ব্যবসায়ীরা এখন শুধু টাকা রোজগার করেই তুষ্ট নন, তাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদারিত্বেও আগ্রহী। তাঁরা সংসদে যেতে চান, মন্ত্রী হয়ে ব্যবসা বানিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করতে আগ্রহী। ক্ষমতায় গিয়ে ব্যবসা করতে পারলে যে রাতারাতি সীমাহীন সম্পদ আহরণ করা সম্ভব, তা তাঁরা অভিজ্ঞতার আলোকেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. **নির্বাচনী ইস্তেহার, দৈনিক ইত্তেফাক**, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১।

২. **প্রাগুক্ত** ২৯ জানুয়ারী, ১৯৯১।

৩. **প্রাগুক্ত** ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১।

৪. এ. কে. এম. শহীদুল্লাহ, "বাংলাদেশ সংসদীয় নির্বাচন- ১৯৯১" দ্রষ্টাব্য: অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, **বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা**, কয়েস বুক করপোরেশন, ঢাকা, মে ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ২৩।

৫. ঐ।

৬. ঐ।

৭. ঐ।

৮. ডঃ আবুল ফজল হক, **বাংলাদেশের রাজনীতিঃ সংঘাত ও পরিবর্তন**, সুদীপ্ত প্রিন্টার্স এ্যান্ড প্যাকেজেস লিঃ, ঢাকা, জানুয়ারী, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা: ৩৪২।

৯. ডঃ আবুল ফজল হক, **প্রাগুক্ত**, পৃষ্ঠা: ৩৫৯।

১০. ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকাকালে, ১৯৭৯ সালে বি. এন. পির শাসনামলে আর জেনারেল এরশাদের সাড়ে নয় বছরের শাসনামলে ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ তে জাতীয় সংসদের অপর চারটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১১. **The Weekly Holiday**, ১১ এপ্রিল, ১৯৮৬।

১২. **The New Nation**, ৮মে, ১৯৮৬।

১৩. আহমদ উল্লাহ (সম্পাদনা), **পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামান্য গ্রন্থ**, সুচয়ন প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ৩১।

১৪. Talukder Maniruzzaman and U.A.B Rezia Akter Banu, "Civilian Succession and 1981 Presidential Election in Bangladesh," in Peter Lyon and James, Manor (eds.), **Transfer and Transformation**;

Dhaka University Institutional Repository

Political Institutions in Commonwealth, Leicester; Leicester University Press, 1983, P- 129.

১৫. আহমদ উল্লাহ (সম্পাদনা), **পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামান্য গ্রন্থ** (সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত), সূচয়ন প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯২ থেকে সংগৃহিত।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- ৪

সংসদীয় সরকারের কার্যকারিতা (১৯৯১-১৯৯৬)

Working of the Parliamentary form of Government (1991-1996)

বৃটিশ ভারতে প্রবর্তিত সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশের প্রকৃত উত্তরাধিকার। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের সংবিধানেও সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে এ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তিত হয়। সংবিধানের এই সংশোধনী ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত গণভোটের দ্বারা গৃহীত হয়। উল্লেখ্য সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুন:প্রবর্তিত সংসদীয় পদ্ধতির ব্যাপারে দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায়।

সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তিত হবার পর থেকে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিশেষত সংসদে যে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব ছিল তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে এমনকি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও ব্যাপক মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এই মতবিরোধ গঠনমূলক ভাবে পরিচালিত হবার মাধ্যমে সংসদকে দেশের সকল ফর্মকান্ডের মূল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার পরিবর্তে একে মূলত অকার্যকর করে তুলে। নিম্নে ১৯৯১-১৯৯৬ সময়ে জাতীয় সংসদের কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হলো।

৪.১ অধিবেশন সমূহের আলোচনা

Discussions of the Sessions

পঞ্চম জাতীয় সংসদের পাঁচ বৎসরের কার্যকালে ২২টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। একটি বাস্তব অগ্রসরমান সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য এই কার্যক্রম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অভিসন্দর্ভের এই অধ্যায়ের অংশে এই বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমেই সংসদের অধিবেশন সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করা হলো। বিএনপি সরকারের পাঁচ বৎসরের শাসনামলে ২২টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এর সার্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংসদের কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নিম্নের ৪.১ এর সারণীতে তা দেখানো হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৪.১

পঞ্চম সংসদ অধিবেশনসমূহের শুরু, শেষ ও মোট কার্যদিবস

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট কাজ
প্রথম	৫-৪-৯১	১৫-৫-৯১	৪১	২২
দ্বিতীয়	১১-৬-৯১	১৪-০৮-৯১	৬৫	৪৩
তৃতীয়	১২-১০-৯১	০৫-১১-৯১	২৫	১৪
চতুর্থ	০৪-০১-৯২	১৮-০২-৯২	৪৬	২৭
পঞ্চম	১২-০৪-৯২	১৯-০৪-৯২	০৮	০৬
ষষ্ঠ	১২-০৬-৯২	২০-০৭-৯২	২০	১৭
সপ্তম	১০-০৮-৯২	২৮-০৮-৯২	১৯	১০
অষ্টম	২০-০৯-৯২	২৬-১১-৯২	৩৭	২৮
নবম	২৫-০১-৯৩	০৪-০৩-৯৩	৪০	২০
দশম	০৫-০৬-৯৩	২২-০৬-৯৩	১৮	১৪
এগার	২৭-০৯-৯৩	১৫-০৩-৯৩	১৮	১৬
বারো	০২-১০-৯৩	১৯-১০-৯৩	২১	১৯
তেরো	০৮-০১-৯৪	০৩-০২-৯৪	২৭	১৮
চৌদ্দ	০৪-০৫-৯৪	৩০-০৫-৯৪	২৬	১৯
পনেরো	০৬-০৪-৯৪	১১-০৭-৯৪	৩৫	২৭
ষোল	৩০-০৮-৯৪	১৩-০৯-৯৪	৪২	২২
সতের	০৮-১১-৯৪	৩০-১১-৯৪	২২	১৮
আঠার	২৩-০১-৯৫	২৮-০২-৯৫	২৬	১৬
উনিশ	২০-০৩-৯৫	২৭-০৪-৯৫	৩৮	২০
বিশ	২৭-০৬-৯৫	২৮-০৭-৯৫	৩১	১৭
একুশ	২৬-০৯-৯৫	০২-১০-৯৫	২৬	২৪
বাইশ	১৪-১১-৯৫	২৪-১১-৯৫	১১	০৮
মোট কার্যদিবস				

Dhaka University Institutional Repository

সূত্র ঃ জালাল ফিরোজ, **পার্লামেন্টারী শব্দ কোষ**, প্রকাশক গোলাম মঈন উদ্দিন, পাঠ্য পুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী।

প্রথম অধিবেশন

প্রথম অধিবেশনে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন ও শপথ গ্রহন অনুষ্ঠিত হয় (৫ এপ্রিল)। আবদুর রহমান বিশ্বাসকে স্পীকার এবং শেখ রাজ্জাক আলীকে ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করা হয়। এরা দু'জনই বিএনপি এর দলীয় সদস্য ছিল। বিরোধী দলের বিরোধীতা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নির্বাচিত করা হয়। বৃটেনে দেখা গেছে যে, উক্ত পদ দুটোতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে স্বীয় দলের লোককে নির্বাচনের সুযোগ থাকলেও সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সকল দলের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করে একজন গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হয়

একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আবদুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি হয়ে যাবার পর শেখ রাজ্জাক আলী স্পীকার ও হুমায়ুন খান পন্নী ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। আবদুর রহমান বিশ্বাস এর স্পীকার ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া দুটোই ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংসদীয় রীতি বিরোধী। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন বরিশাল জেলা শাখার শান্তি কমিটির সহসভাপতি, একজন রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তি কখনই সংসদ বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিতে পারেন না। অপরদিকে হুমায়ুন খান পন্নীও স্বাধীন দেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন '৭৭ সাল পর্যন্ত। কাজেই পঞ্চম জাতীয় সংসদের সূচনা হয়েছে জনপ্রতিনিধিত্বের প্রকৃত দায়কে ভুলুণ্ঠিত করে। ১৯ নভেম্বরের ঘোষণাকে বিস্মৃত করে, নির্বাচনী ঘোষণাকে পায়ে দলে এবং সর্বোপরী সংসদীয় গণতন্ত্রের সত্যিকার স্পিরিটকে বানচাল করে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উল্লেখিত ভ্রান্তি সংসদীয় রীতির সাথে অসঙ্গতপূর্ণ আচরণের ধরণ ভবিষ্যতে দেশে সংসদীয় সংস্কৃতির বিকাশকে নেতিবাচক অর্থেই প্রভাবিত করবে বলে মনে হয়।[১]

দ্বিতীয় অধিবেশন

দ্বিতীয় অধিবেশনে সর্ব সম্মতি ক্রমে (৬ আগষ্ট) সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল দু'টি অনুমোদিত হয়। একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের পূর্বপদে প্রত্যাবর্তন সম্পন্ন হয় এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার কার্যকলাপ বৈধতা পায়। দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বৎসর পর রাষ্ট্র পুনরায় সংসদীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনে আসে। যে

Dhaka University Institutional Repository

সমঝোতা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে এই বিল দু'টি পাশ হয়েছিল তা ছিল সংসদীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত। কিন্তু এ ধারা পরবর্তীতে আর টিকে থাকেনি।

তৃতীয় অধিবেশন

তৃতীয় অধিবেশন ছিল (১২ অক্টোবর ৯১) সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের পর প্রথম অধিবেশন। ২৫ দিন ব্যাপী এই অধিবেশনে কার্যদিবস ছিল ১৪ দিন। এতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, ৩৪টি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় কিন্তু কোরামের অভাবে সেগুলির মূলতবী ঘোষণা করা হয়। এই অধিবেশনে সদস্যদের অনুপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান মাত্র ১ দিন এবং প্রধানমন্ত্রী মাত্র ৩ দিন উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের শেষ দিন জামায়াতের সংসদীয় নেতা মতিউর রহমান নিজামী এই বিষয়টি জোড়ালোভাবে উত্থাপন করে বলেন যে সংসদ কার্যকারিতায় বাংলাদেশ নির্ভর করে সংসদ নেতা বা নেত্রীর উপস্থিতির উপর। সরকারী দলের উপনেতা বদরুদ্দৌজা চৌধুরী এই মতের সাথে একাত্ম না হয়ে বরং সংসদ সঠিকভাবে কার্য পরিচালনা করছে বলে দাবী করেন। স্পীকারও এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে পক্ষপাতিত্ব করেন। অথচ সংসদীয় রীতি অনুযায়ী উচিৎ ছিল সকল সদস্যেরই ভুল বা অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া, যেটি এই সংসদে পরিলক্ষিত হয়নি।

চতুর্থ অধিবেশন

চতুর্থ অধিবেশন ছিল শীতকালীন। '৯২ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে উপজেলা অধ্যাদেশ বাতিল প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক হয়। এই অধিবেশনেও দেরী করে উপস্থিত হওয়া এবং অনুপস্থিতির হার ছিল লক্ষনীয়।

পঞ্চম অধিবেশন

পঞ্চম অধিবেশনে গোলাম আযম প্রসংগে তর্ক বিতর্ক শুরু হলে বিরোধী দল যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে তার বিচার দাবী করে। সরকারী দল আইনানুগ পদ্ধতিতে বিচার নিস্পত্তির আহ্বান জানায়। এতে বিরোধী দল ওয়াক আউট করে ফলে অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধিবেশন

৬ষ্ঠ অধিবেশনে ১২ জুন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান জাতীয় সংসদে ৯১-৯২ সালের বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটের মাধ্যমে এই প্রথম মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট আরোপ করা হয়। যার মাধ্যমে অতিরিক্ত দু'শ ৫০ কোটি টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। এটি একটি ভাল উদ্যোগ ছিল। এছাড়া এই অধিবেশনে চলমান বিবিধ সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়।

সপ্তম অধিবেশন

৭ম অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, (১০ আগষ্ট '৯২) বিএনপি সরকারের বিরূদ্ধে মোট ৭টি দল যেমন- আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, সিপিবি, গণতন্ত্রী পার্টি, ন্যাপ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। অনাস্থার বিভিন্ন কারণ বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন। যেমনঃ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, জনগনের জানমালের নিরাপত্তাহীনতা, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা, অর্থনৈতিক দূরাবস্থা প্রভৃতির উল্লেখ করেন। অনাস্থা প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত ছিল। কারন '৯২ সালে সন্ত্রাসী তৎপরতাসহ বিভিন্ন অপকর্ম বেড়ে যায়। যার জন্য সরকার ও বিরোধী দল উভয়ে উভয়কে দোষারোপ করে। ১২ আগষ্ট দীর্ঘ ১৭ ঘন্টা আলোচনা সমালোচনার পর অনাস্থার বিরূদ্ধে বিএনপি ১৬৮-১২ ভোটে জয়লাভ করে। একমাত্র জামাতে ইসলামী ভোটদানে বিরত থাকে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিয়ে সরকার রাজনৈতিক দুরদর্শিতার পরিচয় দেয়। প্রধানমন্ত্রীর সমাপনী ভাষণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিরোধী নেত্রীর ভাষণে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীদের অযোগ্যতা, অনভিজ্ঞতা, অদক্ষতা, সিদ্ধান্তহীনতার মন্তব্য করে যে অভিযোগ করা হয়েছিল তার জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিএনপি'র মন্ত্রীরা ব্যর্থ, তারা দেশ চালাতে পারে না আমি নাম বলব না, এখানেও অনেকেই আছেন। কিন্তু তারা অধীর আগ্রহে বিএনপি-তে যোগদান করতে চায়। কিন্তু একটি শর্ত- ১ম শর্ত হচ্ছে আমাদের যদি ঐ জায়গাটি দেয়া হয় ঐ সুযোগটি দেয়া হয় তাহলে আমরা বিএনপিতে যোগদান করবো এবং বিএনপি তখন খুব ভাল হয়ে যাবে। কোন অনিচ্ছাই থাকবে না।"[২] প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সত্যতা এখানেই যে জাতীয় স্বার্থে নয় বরং দলীয় স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার জন্যই দলগুলি অনাস্থা আনে। এই বৈঠকে পুশইন, মেনন হত্যা প্রচেষ্টা এবং ইনডেমনিটি বিল নিয়েও আলোচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধিবেশন

৮ম অধিবেশনে সরকারের তৎপরতায় বহুল বিতর্কিত সন্ত্রাস দমন বিল উত্থান করা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর '৯২ হতে এই অধ্যাদেশটি কার্যকর ও বলবৎ হবার পর থেকেই সকল রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ছাড়া সকল ছাত্র শিক্ষক সংগঠন এর তীব্র বিরোধীতা ও নিন্দা করে। এর প্রতিবাদে সকল বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে। ১৬ সেপ্টেম্বর '৯২ তারিখে বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টির পলিটব্যুরোর ষ্টান্ডিং কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশকে নিকৃষ্ট অধ্যাদেশ হিসেবে অভিহিত করে বলা হয় যে, যেখানে প্রচলিত আইনেই সন্ত্রাস ও অপরাধ দমন সম্ভব সেখানে জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে এ ধরণের বিশেষ অধ্যাদেশ জারির অর্থ হলো বিশেষ ক্ষমতা আইনের চেয়েও নিকৃষ্টতম অধ্যাদেশের অক্টোপাশে দেশ ও জাতিকে আবদ্ধ করা।[৩]

নবম অধিবেশন

৯ম অধিবেশনে '৯৩ সালের জানুয়ীর শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত প্রায় ২০ দিনের কার্যদিবসের একটি রেকর্ড স্থাপিত নয়। এতে ১টি বেসরকারী বিলসহ ১২টি বিল পাশ হয়। এই অধিবেশনে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে তাহলো মন্ত্রীর এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ডেপুটি স্পীকারের ডায়াসের সামনে গিয়ে-মারমুখো বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এতে করে সংসদের কার্যকরী দিবসটি নষ্ট হয়ে যায়।

দশম অধিবেশন

দশম অধিবেশন মাত্র পাঁচ দিন স্থায়ী হয়। এই অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে না যাওয়া নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উভয় দলের মধ্যে উত্তেজনা হাতাহাতি পর্যায়ে যায়। এতে আওয়ামী লীগ ও মিত্রদলগুলি বাংলামটরে ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির সমাবেশে হামলার অভিযোগে ওয়াক আউট করে।

একাদশ অধিবেশন

১১ দশ অধিবেশন হয় '৯৩ এর সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে শরৎকালীন অধিবেশন শিরোণামে এই অধিবেশনে আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ কৃষিমন্ত্রী এম মজিদুল হক এর বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেন। উভয় পক্ষের বাক-বিতন্ডার পর দূর্নীতির তদন্তের সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু কমিটি ৭৪ দিন কাজ করার পরও Terms of reference ঠিক করতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা খুনের কারণে বিরোধী ও সরকারী দল সংসদে জামাত শিবির বে-আইনী ঘোষণা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে জঙ্গী বক্তব্য রাখে। বিরোধী পত্রিকাগুলি বিএনপির ভূমিকাকে "শাসক দলের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা পক্ষ বিপক্ষ শক্তির তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের বহি:প্রকাশ বলে বর্ণনা করে।"

দ্বাদশ অধিবেশন

১২দশ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তার এক কথিত উক্তির জন্য সংসদ অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। পরে বিরোধী নেত্রীর বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে সাংবিধানিক অথবা বিধি-মোতাবেক ব্যবস্থা গৃহীত না হয়ে বরং ইগো সমস্যা নিপতিত হয়। বিরোধী নেত্রী পদত্যাগের হুমকী দেন। পরে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। এই সময় বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ৬টি অভিযোগ আনে। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে দলীয়করণ, তথা ফেব্রুয়ারী, '৯৩ এ অনুষ্ঠিত মিরপুর ১১ আসনে 'ভোট ডাকাতি'-, প্রধানমন্ত্রীর সংসদে অনুপস্থিতি, সন্ত্রাস দমন আইন এর অপ-প্রয়োগ ও মন্ত্রীদের অশালীন আচরণ।[৪]

ত্রয়োদশ অধিবেশন

১৩দশ অধিবেশন শীতকালীন অধিবেশন হিসেবে বিবেচিত হয়। '৯৪ এর জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ অধিবেশন থেকেই অচলবস্থার সৃষ্টি হয়। সেটি শুরু হয়েছিল মাগুরা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং শেষ হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে সাংবিধানিক দাবী নিয়ে। তবে তাৎক্ষনিক কারণ ছিল তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদার একটি অশোভন উক্তিকে কেন্দ্র করে। ইসরাইল কর্তৃক হেবরন হামলার বিষয়টি সংসদে উত্থাপিত হলে তথ্যমন্ত্রী প্রধান বিরোধী দলের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে রসিকতা করলে বিপত্তি শুরু হয়। ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদে বিরোধী দল অধিবেশনের মাঝামাঝি সময় থেকে বেরিয়ে আসে। পরে আর ফিরে য়ায়নি। তাদের পক্ষ থেকে ৩ দফা দাবী উত্থাপিত হয়। ১) মন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনা ২) মাগুরার উপনির্বাচন বাতিল এবং ৩) সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল উত্থাপন।

চতুর্দশ অধিবেশন

১৪ দশ অধিবেশন শুরু হয় ৪ঠা মে '৯৪ সংকট নিরসনে কোন রকম কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন না করেই। মাত্র ৬ দিনের কার্যকালের পর বিরোধী দলের অব্যাহত অনুপস্থিতির মধ্যেই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। এই

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশনে মাত্র তিন মিনিটে দু'টি বিল পাশ করা হয়। এর আগে ক্ষমতাসীন দলের ষ্ট্যান্ডিং কমিটিকে বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু তারা সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া অভিযোগ করেন বারবার সংসদকে অচল রেখে আওয়ামী লীগ সংসদীয় গণতন্ত্রকে বিষাক্ত করে তুলেছে। সংসদের কথাবার্তা যদি সংসদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে গণতন্ত্রের চর্চা ব্যর্থ হতে বাধ্য।[৫] অধিবেশনের প্রথম দিন ৭মিঃ স্থায়ী ভাষনে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী গ্রুপগুলিকে সংসদে যোগদানের জন্য আনুষ্ঠানিক আহবান জানান। এর জবাবে বিরোধী নেত্রী বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ অন্তঃসার শূন্য তার ভাষণে এমন কিছু নেই যে, বিরোধীদল সংসদে ফিরে যেতে পারে।

পঞ্চদশ অধিবেশন

পঞ্চদশ অধিবেশন ৬ জুন '৯৪ তারিখে শুরু হয়। বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বর্জন। এটি ছিল বাজেট অধিবেশন। তাই বিরোধী দলের অংশগ্রহন সংসদীয় রাজনীতি অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ৯ জুন সংসদে পেশ করা হয় সরকারের ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং '৯৪-৯৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট[৬] ১৯৯৩-৯৪ বাজেটে সর্বাধিক ২৭২৭ কোটি টাকা শিক্ষা খাতে এবং দ্বিতীয় ১৬২৪ কোটি টাকা সামরিক খাতে বরাদ্দ করা হয়। তবে ১৯৯২-৯৩ বাজেটেও এদুটি খাতে বেশী বরাদ্দ করা হলেও দারিদ্র্য বিমোচনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এদের বরাদ্দের পরিমান ১৪৮১ কোটি টাকা। এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এডিবিতে মোট বরাদ্দের ১৫ শতাংশ। সরকারী দল সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিরোধী দল উথাপিত বিল উপস্থাপনার সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই ধারণা হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহন ব্যতিরেকে তারা সংসদে ফিরে যাবে না, তবে এই বর্জন নিয়ে তাদের মধ্যে মতদ্বৈতা ছিল। জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগ তখনই মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য কাজ করে। অপরদিকে জামাত পাঁচ দল, গণফোরাম, ইসলামী ঐক্যজোট ইত্যাদি দলের বক্তব্য সংসদ তার কার্যকাল পুরা করুক। উক্ত বাজেট সম্পর্কে গণতান্ত্রিক পার্টির সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, "ঘোষিত বাজেট সংবিধান সম্মত নয়। কারণ একক সরকারী দলের নব্য স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রকাশ সম্বলিত একটি চাপানো বাজেট"।[৭] ১১ জুলাই '৯৪-৯৫ অর্থ বছরের বাজেট অধিবেশনে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। জাতির ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম ঘটনা যে ক্ষেত্রে বাজেট অধিবেশনের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিরোধী কোন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন না।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠদশ অধিবেশন

ষষ্ঠদশ অধিবেশন শুরু হয় ৩০ আগষ্ট, ১৯৯৪ তারিখে। এ সংসদে বিএনপির মাত্র ৬২ জন সাংসদ উপস্থিত ছিল। ১৩ সেপ্টেম্বর '৯৪ পর্যন্ত অধিবেশন চলে বিরোধী দলের অব্যাহত সংসদ বর্জনের মধ্য দিয়ে। এতে জামাতে ইসলামী কতিপয় সংসদ কর্তৃক ইতিপূর্বে সংসদ সচিবালয় জমা দেয়া কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে সরকারী দলের কয়েকজন সদস্যের প্রস্তাব উথাপন ও সেগুলির উপর আলোচনা করা হয়।

সপ্তদশ অধিবেশন

সপ্তদশ অধিবেশন শুরু হয় ৮ নভেম্বর ১৯৯৪। এই অধিবেশন শুরুর আগে রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর '৯৪ তারিখে কমনওয়েলথ মহাসচিব জেনারেল এমেকা আনিয়াকু পাঁচদিনের সরকারী সফরে বাংলাদেশে আসেন, তিনি বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাথে পৃথক পৃথক বৈঠক করেন। নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রশ্নে, নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করন এবং উপযুক্ত নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রণয়ন এই তিনটি বিষয়কে আলোচ্য সূচী হিসেবে নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বৈঠক করার প্রস্তাব দেন এবং তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্ণর স্যার নিনিয়ান স্টিফেনকে তার বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগের কথা ঘোষনা করেন। ১৩ নভেম্বর তিনি ঢাকায় আসেন। দীর্ঘ এক মাস তার মাধ্যমে সরকার ও বিরোধী উপনেতার মাধ্যমে আলোচনা চলে, কিন্তু এই আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। সপ্তদশ অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন "আমাদের সমস্যা আমরা নিজেরাই সমাধানে সক্ষম, বাহিরের কোন সহযোগিতা প্রয়োজন নেই"। অপর দিকে বিরোধীদল সংসদের বাইরে থেকে তাদের সরকার বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

অষ্টাদশ অধিবেশন

অষ্টাদশ অধিবেশনের পূর্বে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়। এর ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা, বিরোধী দল একের পর এক হরতাল অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচী দিতে থাকে। অর্থাৎ সংসদীয় রাজনৈতিক দল চলে আসে রাজপথে। হাইকোর্ট তাদের অব্যাহত সংসদ বর্জন বে-আইনী ঘোষণা এবং পরবর্তী অধিবেশন ঘোষণার নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও ১৪৭ জন সংসদ সদস্য ২৮ ডিসেম্বর '৯৪ আনুষ্ঠানিক ভাবে পদত্যাগ করে, এতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং জনমনে সৃষ্টি হয়

Dhaka University Institutional Repository

হতাশা ও উদ্বেগ। এই প্রেক্ষিতে ২৮ ডিসেম্বর '৯৪ তাদের পদত্যাগ সংসদ আইনের বলে অবৈধ ঘোষণা করে। এই অবস্থায় ২৩ জানুয়ারী '৯৫ অষ্টাদশ অধিবেশনের আহবান করা হয়। ঐদিন স্পীকার বিরোধীদের পদত্যাগের বিরুদ্ধে রুলিং জারী করেন। সংসদ ভাকায় স্পীকার আদালতের অবমাননা করেছেন বলে প্রধান বিরোধী সংসদ নেতৃবৃন্দ পৃথকভাবে মামলা দায়ের করে।

উনিশতম অধিবেশন

'৯৫ এর মার্চে উনিশতম অধিবেশন বসে এবং ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত চলে। বিরোধীদল বিহীন নিস্প্রান এই অধিবেশনের কোন কর্ম তৎপরতা ছিল না। এই সময়ে এক হিসেবে সংসদ তার বৈধতা হারায়।

বিশতম অধিবেশন

২৭ জুন বিশতম অধিবেশন বসে। এটি ছিল বাজেট অধিবেশন। ২৯ জুন '৯৫-৯৬ অর্থ বছরের বাজেট পাশ হয়। এই বাজেটে বিদ্যমান কাঠামোকে দক্ষভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হওয়ায় রাজস্ব আয় বাড়ে। এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন করের অবদান বেশী। বিরোধীদের অনুপস্থিতিতে প্রণীত এই শেষ বাজেট দেশ ও বিদেশে তীব্র অবমাননার সম্মুখীন হয়। এই অধিবেশন শেষে সংবিধানের ১০৬ ধারা মোতাবেক প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম পদত্যাগকৃত সদস্যদের আইনগত অবস্থান সম্পর্কে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা চান সুপ্রীম কোর্টের কাছে। ২৭ জুলাই ৯৫ প্রধান বিচারপতিসহ পাঁচজন বিচার পতি সমন্বয়ে গঠিত আপীল বিভাগ সিদ্ধান্ত দেয় যে, বিরোধী সদস্যদের ওয়াকআইট, বয়কট অনুমতি বিহীন অনুপস্থিত বলে গন্য হবে এবং ঐ দিনই উক্ত সদস্যদের পদ শূন্য ঘোষণা করে। এই কারণে ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান এর বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে উপনির্বাচনে অংশ গ্রহন করে সাংবিধানিক সংকট দূর করার আহবান জানালে তারা যে কোন মূল্যে এই নির্বাচন ঠেকাবে বলে ঘোষণা দেয়।[৮]

একুশতম অধিবেশন

একুশতম অধিবেশন ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলে। এই অধিবেশনে ফ্লোর ক্রসিং এর কারণে ৩ জন সদস্যের সদস্যপদ বাতিলের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়। এবং প্রেসিডেন্টের পেনশন, আইসিডিডিআরবি সংক্রান্ত দুটি বিল উত্থাপন হয় এবং বিল দুটি পাশ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাইশতম অধিবেশন

বাইশতম অধিবেশনের পূর্বে রাজনৈতিক অচলতা দূর করার জন্য বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে আসেন। তারা উভয়পক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে কোন মীমাংসায় আসতে ব্যর্থ হন। এরপর শুরু হয় পত্র যোগাযোগ। ২৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বিরোধীনেত্রীকে আলোচনার আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রন জানান। ৩০ অক্টোবর তিনি পত্রে জবাব দেন। পর পর তিনটি পত্র বিনিময় উভয় পক্ষের কাছে গ্রহনযোগ্য আলোচ্য সূচী নির্ধারণে ব্যর্থ হয়।[৯] নিজ নিজ অবস্থানে অনড় থাকার জন্য এই যোগাযোগ কোন সমাধান দিতে পারেনি। অপরদিকে বিরোধী দলও তাদের আন্দোলন তীব্রতর করে। এই প্রেক্ষিতে ১৪ নভেম্বর '৯৬ শুরু হয় পঞ্চম সংসদের অঘোষিত সমাপ্তি অধিবেশন। ২২ নভেম্বর উপনির্বাচনের সিডিউল পুন:ঘোষিত হয়। বিরোধী অনড় অবস্থানের কারণে ২৪ নভেম্বর '৯৫ প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম বেতার টেলিভিশন বক্তৃতায় পঞ্চম সংসদের সমাপ্তির ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এবং ঐদিনই প্রেসিডেন্ট পঞ্চম সংসদ বিলুপ্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।

উপরের বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যায় যে পঞ্চম সংসদ শুরু হয় ৫ এপ্রিল '৯১ এবং ২৮ নভেম্বর '৯৫ পর্যন্ত এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। এই দীর্ঘ সময় ২২ টি অধিবেশনে ৩৯৬ টি কার্যক্রম অতিবাহিত করে। তবে এই অধিবেশনগুলি অধিকাংশই বিরোধী দলের অংশগ্রহন ছাড়াই সম্পন্ন হয়। কেননা বিরোধী দল মাত্র ১৩ টি অধিবেশনে অংশগ্রহন করে। ত্রয়োদশ অধিবেশনের পর থেকে তারা সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে। আনুষ্ঠানিকভাবে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে ২৮ ডিসেম্বর '৯৪, সপ্তদশ অধিবেশন থেকে। এই তেরতম অধিবেশন থেকে সতেরতম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদের অধিবেশন ছিল ৮১ টি এবং সপ্তদশ অধিবেশন পর্যন্ত কার্যক্রম ছিল ৩৪৮ টি।[১০] এই অধিবেশনগুলির মান ছিল খুবই নিম্ন। কারণ বিশ মাসেরও বেশী সময় পর্যন্ত এই সংসদ বিরোধী দলের অংশ গ্রহন ব্যতীত পরিচালিত হয়েছে। অপরপক্ষে সংসদের যে অধিবেশন সমূহে তারা উপস্থিত ছিল সে গুলিও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারেনি। এভাবে পঞ্চম জাতীয় সংসদের (১৯৯১-৯৬) কার্যকরী করণের পথে অন্তরায় সমূহ নিম্নোক্ত ভাবে উপস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

আইন প্রণয়ন

প্রত্যেক দেশের আইনসভার মূল কাজ আইন প্রণয়ন করা। আইনসভার প্রণীত আইন দারা রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থাগুলো পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উপর আইন প্রণয়ন করার কঠিন দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। দেশের জন্য আইন প্রণয়ন কাজে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ অধিকাংশ সময় ব্যয় করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকারী উদ্যোগে মোট ২০৯ টি সাধারণ বিলের নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৮৪ টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিলগুলোর মধ্যে আটটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করে নেন, একটি তামাদি, একটি অনিস্পন্ন রয়ে যায় এবং একটি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে জাতীয় সংসদে মোট ১৭২ টি বিল পাস হয় দেখুন সারণী ৪.২। বিশেষ লক্ষ্যনীয় যে, বিরোধী দলের একাধিক্রমে সংসদ বর্জন ও পদত্যাগের পর ৫৩ টি বিল পাস হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৪.২

পঞ্চম সংসদে উত্থাপিত ও গৃহীত সরকারী সাধারণ বিলের অধিবেশন ওয়ারী সংখ্যা

অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	সংসদে পাসকৃত বিলের সংখ্যা
প্রথম অধিবেশন (০৫.০৪. ৯১-১৫.০৫.৯১)	৩০	২৩	১৮
দ্বিতীয় অধিবেশন (১১.০৬.৯১-১৪.০৮.৯১)	১১	১১	১০
তৃতীয় অধিবেশন (১২.১০.৯১-০৫-১১-৯১)	১২	১১	৪
চতুর্থ অধিবেশন (০৪.০১.৯২-১৮.০২.৯২)	১৬	১৩	৮
পঞ্চম অধিবেশন (১২.০৪.৯২-১৯.০৪.৯২)	১	১	০
ষষ্ঠ অধিবেশন (১৮.০৬.৯২-১৩.০৮.৯২)	২৯	২৬	১৮
সপ্তম অধিবেশন (১১.১০.৯২-০৬.১১.৯২)	১৫	১৪	৮
অষ্টম অধিবেশন (০৩.০১.৯৩-১১.০৩.৯৩)	১০	১০	১০
নবম অধিবেশন (০৯.০৫.৯৩-১৩.০৫.৯৩)	৬	৪	০
দশম অধিবেশন (০৬.০৬.৯৩-১৫.০৭.৯৩)	১০	৯	৯
একাদশ অধিবেশন (১২.০৯.৯৩-২৭.০৯.৯৩)	৫	৪	৩
দ্বাদশ অধিবেশন (০২.১০.৯৩-১৯.১০.৯৩)	৬	৫	৪
ত্রয়োদশ অধিবেশন (০৮.০১.৯৪-০৩.০২.৯৪)	৭	৬	২
চতুর্দশ অধিবেশন (০৪.০৫.৯৪-৩০.০৫.৯৪)	৩	২	২
পঞ্চদশ অধিবেশন (০৬.০৬.৯৪-১১.০৭.৯৪)	১০	৯	৭
ষষ্ঠ অধিবেশন (৩০.০৮.৯৪-১৩.০৯.৯৪)	২	২	২
সপ্তদশ অধিবেশন (০৮.১১.৯৪-৩০.১১.৯৪)	৬	৬	৬
অষ্টাদশ অধিবেশন (২৩.০১.৯৫-২৮.০২.৯৫)	১২	১১	৯
উনিশতম অধিবেশন (২০.০৩.৯৫-২৭.০৪.৯৫)	২	২	১
বিশতম অধিবেশন (২৭.০৬.৯৫-২৮.০৭.৯৫)	৯	৯	৮
একুশতম অধিবেশন (০৬.০৯.৯৫-২৬.০৯.৯৫)	৫	৫	৪
বাইশতম অধিবেশন (১৫.১১.৯৫-১৮.১১.৯৫)	২	১	১
মোট	২০৯	১৮৪	১৭২

উৎস ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, **জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালীর সারাংশ**, ২২ খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ কমিটি ব্যবস্থা ও কার্যক্রম

Committee System and Activities

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদগুলোর কর্মকান্ডে একটি প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হলো এই কমিটি ব্যবস্থা। উন্নত বিশ্বে কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠু আইন প্রণয়ন এবং সরকারের দায়িত্বশীলতা বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কমিটিগুলি বিভিন্ন রকম হতে পারে যথা ষ্ট্যান্ডিং কমিটি, সিলেক্ট কমিটি, পাবলিক একাউন্টস কমিটি, স্থায়ী কমিটি। এই কমিটিগুলির আবার বিভিন্ন রকম উপ বা সাব কমিটি থাকতে পারে। কমিটিসমূহের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি হলো-

১) আইন পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে পেশকৃত সকল বিল ও অন্যান্য বিষয়ের উপর পুংখানুপুংখ বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভাবপর হয়ে উঠে না। তাই শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে আইনের খুঁটিনাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এই কমিটির মাধ্যমে। "মূল্যবান সংসদীয় সময় বাঁচানো এবং জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের লক্ষ্যে সাংসদগন বিভিন্ন কমিটি এবং উপকমিটিতে বিভক্ত হয়ে সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করেন। সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার পক্ষে একটা মৌলিক যুক্তি হচ্ছে আইন পরিষদগুলির প্রধান কার্যাবলী কি তা নির্ধারণ করা।"[১১]

২) এর মাধ্যমে সংসদ সদস্যরা চলমান রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সঠিকভাবে পর্যালোচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসকদের কাছে অসংখ্য প্রশ্ন তুলে ধরতে পারেন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন।

৩) নির্বাহী বিভাগ তথা সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কমিটি ব্যবস্থা আইন পরিষদের বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ সঠিক সময়ে সংসদে বিলের রিপোর্ট পেশ করে। তবে তারা বিলের মৌল নীতি পরিবর্তন করতে পারে না।

বাংলাদেশে সংবিধানে আইন সংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠনের বিধান রয়েছে। সংবিধানের ৭৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদকে সংসদীয় বিধি অনুসারে পাবলিক একাউন্স কমিটি সহ অন্যান্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৭ তম অধ্যায়ের ১৮৭ থেকে ২১৬ ধারাগুলোতে কমিটি সমূহের গঠন, কাজ ও কর্ম পদ্ধতির বিশদ বিবরণ আছে। সংসদীয় কমিটির সম্ভাব্য ভূমিকা ও সুবিধা বহুবিধ হতে পারে। যেমন, সংসদীয় কমিটিগুলো

Dhaka University Institutional Repository

কেবলমাত্র প্রশাসনিক দক্ষতার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে না বরং ইহা পূর্ববর্তী প্রশাসনিক সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ ত্রুটিগুলিও দূর করতে সহায়তা করে। "The Widespread use of committees is justified on the grounds that they are capable of offering Mps a variety of rewards and opportunities, such as encouraging than to build up more specialized knowledge of policy ares, providing a means of keeping them busy and feeling useful and granting them more active and rewarding participation in the governing process."[১২]

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সংসদীয় বিধিমালা প্রতিটি মন্ত্রনালয়ের জন্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনে নির্বাহী বিভাগের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে এবং বিলসহ অন্যান্য বিষয় পরীক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগামী বলে প্রতীয়মান হয়। এসব কমিটি মাসে অন্তত: একবার বসে প্রশাসনিক বিষয় পর্যালোচনা করার কথা। বাংলাদেশের সংসদের ত্রিবিধ কমিটি বিদ্যমান। মূলত: তাদের স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে এই প্রকারভেদ করা হয়েছে। এগুলি হলো ষ্ট্যান্ডিং কমিটি, সিলেক্ট কমিটি ও স্পেশাল কমিটি। পঞ্চম সংসদে ৫২ টি সংসদীয় কমিটি ও ৬৩ টি উপকমিটি গঠিত হয়। পাঁচ বছরে এগুলির ১৬৫৬ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে কমিটিগুলো ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:

সারণী ঃ ৪.৩

পঞ্চম সংসদের কমিটি সমূহের নাম ও সংখ্যা

নং	কমিটির নাম	কমিটির সংখ্যা
	ষ্ট্যান্ডিং কমিটি	৪৫
১	মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত কমিটি	৩৪
২	অর্থ সম্পর্কিত কমিটি	০৩
৩	অনুসন্ধান কমিটি	০২
৪	নিরীক্ষা কমিটি	০১
৫	সার্ভিস কমিটি	০২
৬	হাউস কমিটি	০৩
	সিলেক্ট ও স্পেশাল কমিটি	
১	বিল সম্পর্কিত কমিটি	০৫
	বিশেষ কমিটি	০২
	মোট = ৫২টি	

Dhaka University Institutional Repository

সূত্র ঃ নিয়াজ আহম্মদ খান, মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, আনম মুনির আহম্মেদ, জবাবদিহিতা, নীতি নির্ধারণ ও সংসদীয় কমিটি, বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, উন্নয়ন বিতর্ক ত্রৈমাসিক জার্নাল, অষ্টাদশ বর্ষ, জুন- ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৭৫।

সারণী ঃ ৪.৪

জাতীয় সংসদের ষ্ট্যান্ডিং কমিটির বিভিন্ন ভাগ ছকের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ-

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি	অর্থ এবং নিরীক্ষা কমিটি	অন্যান্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটি	বিশেষ কমিটি	মোট
প্রতিটি মন্ত্রনালয়ের জন্য ষ্ট্যান্ডিং কমিটি	পাবলিক একাউন্টস এষ্টিমেট এবং পাবলিক আন্ডার টেকিং কমিটি	পিটিশন সুবিধাদি, সরকারী প্রতিশ্রুতি, কার্য উপদেষ্টা, প্রাইভেট সদস্য, বিল রুলস হাউজ এবং লাইব্রেরী কমিটি	বিশেষ বিষয়ে গঠিত কমিটি	
৩৪	৩	৮	৪	৪৯

সূত্র ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

উপরোক্ত ছকে বর্ণিত পাবলিক একাউন্টস কমিটি সংসদের অনুমোদিত সরকারী বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষা করে এবং এসব ক্ষেত্রে সরকারী দপ্তর সমূহের অসঙ্গতি তুলে ধরে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে। এষ্টিমেট কমিটি সম্পূর্ণ অর্থ বৎসরের অনুমিত হিসাব পরীক্ষা করে এবং অর্থনীতি ও প্রশাসনের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে অন্যান্য কমিটিগুলি পিটিশনে প্রদত্ত নির্দিষ্ট অভিযোগ সাংসদদের অধিকার ও দায় মুক্ততা; মন্ত্রীগণ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং অঙ্গীকার সরকারী বিলের সময় বরাদ্দ, বেসরকারী সদস্যগনের প্রস্তাবিত বিল প্রভৃতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। পঞ্চম সংসদে কমিটিগুলোর পেশকৃত রিপোর্টের বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হলোঃ-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৪.৫

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	রিপোর্টের সংখ্যা
১.	পাবলিক একাউন্টস	৩
২.	সরকারী প্রতিষ্ঠান	২
৩.	বিশেষ অধিকার	৮
৪.	রুলস	১
৫.	পিটিশন	১
৬.	আইন ও সংসদীয় বিষয়	১
৭.	জাহাজ শিপিং	১
৮.	শিক্ষা	১
৯.	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন	১
১০.	২২৬ নং বিধি মোতাবেক গঠিত বিশেষ কমিটি	১

সূত্র ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ১৯৯৪।

পঞ্চম সংসদে এপ্রিল '৯১ হতে ডিসেম্বর ৯৪ পর্যন্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩৪ টি কমিটি গড়ে বৎসরে বৈঠকে বসেছে ৭ বার এবং মোট রিপোর্ট দিয়েছে ১৩ টি। আর্থিক কমিটির রিপোর্টের সংখ্যা ৬, বৈঠকের সংখ্যা ১১। অন্যান্য স্থায়ী কমিটির বৈঠকের সংখ্যা ২২, রিপোর্টের সংখ্যা ৫। বিল সম্পর্কিত কমিটির বৈঠকের সংখ্যা ৩, রিপোর্ট নেই, বিশেষ কমিটির বৈঠকের সংখ্যা ২, রিপোর্টের সংখ্যা শূন্য। সার্বিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে কমিটিগুলি বছরে মাত্র ৮ বার বৈঠকে বসেছে এবং উক্ত সময়ে গড়ে সদস্যদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৬০ শতাংশের কাছাকাছি।[১৩]

সূত্র ঃ নিয়াজ আহম্মদ খান, মো: মুস্তাফিজুর রহমান, আনম মুনির আহম্মেদ, জবাবদিহিতা, নীতি নির্ধারণ ও সংসদীয় কমিটি, বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, উন্নয়ন বিতর্ক, ত্রৈমাসিক জার্নাল, অষ্টাদশ বর্ষ, জুন ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৭৫।

এভাবে দেখা যায়, পঞ্চম সংসদের কমিটির রিপোর্ট এবং সুপারিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়িত হয়নি। কেননা কমিটিগুলির বিভিন্ন সভা আহুত হলেও শেষ পর্যন্ত সঠিক সময়ে সংসদ রিপোর্টগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বা পরামর্শ দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে পাবলিক একাউন্টস কমিটির উদাহরণ দেয়া যায়। ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে পাবলিক একাউন্টস কমিটির তৃতীয় রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে অনেক ক্ষেত্রেই এর সুপারিশগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয় না এবং কিছু ক্ষেত্রে একেবারে

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়িত হয়নি। অধিকন্তু মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তি নিরসনসহ অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদনে অনীহা প্রদর্শন করে এবং এভাবে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা বন্ধ করতে কমিটির নির্দেশ বা সুপারিশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। উক্ত রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয় যে শুধু অতীতের হিসাব এবং প্রতিবেদন পরীক্ষা করা বা সুপারিশ করা অর্থহীন কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। এসব কারণে বলা যেতে পারে যে যুক্তরাজ্য বা ভারতের ন্যায় বাংলাদেশের পাবলিক একাউন্টস কমিটি যথেষ্ট কার্যকর হতে পারেনি এবং এর মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়নি।[১৪] এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে সন্ত্রাস নির্মূলের উদ্দেশ্যে সুপারিশ তৈরীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিও কোন সাফল্য দেখাতে পারেনি। কেননা নিজস্ব দলীয় ছাত্র সংগঠনের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কেউই পদক্ষেপ নিতে রাজী হয়নি বলে ঐ কমিটি কোন ঐক্যমত্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয়। এভাবে দেখা গেছে যে সুনির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে টার্মস অব রেফারেন্স মেনে চলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান, সুপারিশ তৈরী প্রভৃতি কাজে কমিটিগুলি ব্যর্থ হয়েছে।

ষ্ট্যান্ডিং বা স্থায়ী কমিটিগুলি স্থায়ীভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা মন্ত্রণালয় সম্পর্কে কাজ করে বলে এর সদস্যরা এর সকল দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে। কিন্তু এই কমিটিগুলির প্রধান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা থাকায় তারা কমিটির কার্যকলাপ বিভিন্ন কৌশলে নিজেদের অনুকূলে নেয়ার চেষ্টা করে যার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুপারিশ বাস্তবায়িত করা হয় না। যেমন কৃষি ও সেচমন্ত্রী মজিদুল হকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করা হয় এবং এজন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় কিন্তু মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপের জন্য অনেকবার বৈঠক হবার পরও টার্মস অব রেফারেন্স প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়। অন্য আরেকটি কমিটিতে জেলাপরিষদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন সম্ভব হয়নি। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বিলের উপর গঠিত বিশেষ কমিটিও কোন চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করতে পারেনি। সংসদীয় ব্যবস্থার উপযোগী নতুন বিধিমালা প্রণয়নে গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটি বিভিন্ন বৈঠক করেও ঐক্যমতে পৌছাতে ব্যর্থ হয়েছে।[১৫] এই জন্য জনাব সামসুল হুদা হারুন স্থায়ী কমিটিগুলিকে Sleeping Committee বলে উল্লেখ করেছেন। এসব সংসদীয় কমিটিসমূহের অকার্যকারীতার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সার্বিক ভাবে কমিটি ব্যবস্থার উপর এবং সংসদ কর্তৃক সরকারের জবাবদিহিতা অর্জনের প্রক্রিয়া অনুপস্থিত থেকে যায়।

জাতীয় সংসদের সকল সদস্যদেরই কমিটি ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এবং ৩৩০ জন সদস্য প্রত্যেকেই অন্ততঃ একটি কমিটির সদস্য। পঞ্চম জাতীয় সংসদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে শক্তিশালী

Dhaka University Institutional Repository

ও সুসংগঠিত বিরোধী দলের উপস্থিতি আছে। পূর্বের সংসদগুলোতে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় ট্রেজারী বেঞ্চের বিশেষ সুবিধা ছিল কিন্তু বর্তমানে সংসদের ৩৩০ সাংসদের ১৫৭ জনই বিরোধী দলীয় এবং সাংসদে বরাবরই সরব থেকেছেন।[১৬]

তবে বিরোধী দলের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও কমিটির বিভিন্ন সিদ্ধান্তে তাদের মতামত নেয়া হয় নাই। পঞ্চম সংসদে দেখা গিয়েছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই অধ্যাদেশ জারী করার পর সংসদের বিল আকারে পেশ করা হয়েছে। এতে সংসদীয় সরকারের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে। কারণ এতে বিরোধীদের অংশগ্রহন ছিল না, বিরোধীরা সবচাইতে বেশী ক্ষুব্ধ হন ট্রেজারী বেঞ্চের বিরুদ্ধে যখন বিশেষ কমিটিতে বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় সন্ত্রাস দমন বিলটি সংসদে পাশ করা হয়। এভাবে উক্ত অধ্যাদেশ জারী সংসদ এবং সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা খর্ব করার সমান এবং সংবিধানের নীতির পরিপন্থী বলে ব্যাপক সমালোচনা করা হয়। বিরোধীরা অভিযোগ করেন যে, সংসদীয় কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন এতে নেই বলে ষ্ট্যান্ডিং কমিটিগুলি কার্যকরী হতে পারছে না এবং স্বয়ং স্পীকার ও মন্ত্রীরা এর প্রধান হওয়ায় নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন হয়েছে। পঞ্চম সংসদে কমিটি ব্যবস্থায় লক্ষণীয় ছিল কমিটির বৈঠকে সরকারী দলের সদস্যদের এমনকি বিরোধীদেরও সংসদে অনুপস্থিত থাকার প্রবনতা। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধী নেত্রী, শেখ হাসিনা কার্য উপদেষ্টার মত গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য ছিলেন এবং স্পীকার ছিলেন এর সভাপতি। অথচ এই বৈঠকে তাদের উপস্থিতি হার ছিল খুবই নগন্য। অথচ জাতীয় সংসদের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যউপদেষ্টা কমিটির ভূমিকা সবচাইতে বেশী। জাতীয় সংসদ কার্যপ্রণালী বিধির ১৯৩ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে কমিটির অনুমতি ছাড়া যদি কোন সদস্য দুই বা ততোধিক বৈঠকে অনুপস্থিত থাকে তবে উক্ত সদস্যকে কমিটি থেকে বহিষ্কারের জন্য প্রস্তাব আনা যাবে। সংসদ সদস্যরা প্রধান মন্ত্রীর অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে প্রস্তাব উথাপন করলেও কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয় নাই। অভিযোগ করা হয়েছে যে, মন্ত্রীবর্গের বিভিন্ন মুখী ব্যস্ততার কারণে কমিটি সমূহের বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না এবং এর ফলে যোগাযোগের পার্থক্যসহ সমন্বয় সাধনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। মন্ত্রীদের মধ্যেও প্রবনতা রয়েছে তাদের দপ্তরের ব্যাপারে অভিযোগ গ্রহনে অনীহা প্রদর্শন করা। অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী সদস্যগনের মতামত বা প্রস্তাবকে গুরুত্ব না দেয়া বা বিবেচনায় না ধরায় অভিযোগ করা হয়েছে।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম সংসদে কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থায় কোন গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। অর্থাৎ কমিটির মাধ্যমে সরকারের দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ষ্ট্যান্ডিং কমিটিগুলি সর্বসম্মত প্রস্তাব প্রণয়নে ব্যর্থ হয়েছে কারণ কমিটিতে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির পরস্পর বিরোধী মতামত ও সিদ্ধান্তহীনতা। এভাবে অনেকবারই বিরোধী দলের ওয়াকআউটের মুখে বিল পাশ হয়েছে। বিরোধী দলগুলি মাগুরা উপনির্বাচনে কারচুপি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে সংসদ অধিবেশন বয়কট করে এবং একই সাথে সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমে অনুপস্থিত থাকে। যার জন্য কমিটি সরকারী দলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এর জন্য বিরোধী দলের একগুয়েমী মনোভাব ও দায়ী ছিল। সরকারী ও বিরোধী দলগুলির কোন্দল শেষ পর্যন্ত কমিটিকে অকার্যকর করে দেয় তথা সংসদীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বাধা সৃষ্টি করে Though structurally the committees seemed to be quite active, operationally they were yet to prove their effectivity".[১৮]

বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটিগুলির কার্যকারিতা সীমিত সাংসদগন নিজ নির্বাচনী এলাকার বিষয়াদি ছাড়া সরকারী কর্মতৎপরতা বা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ কোন কাজে জবাবদিহিতা বা মূল্যায়নের প্রতি বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

৪.৩ কৃষি ব্যবস্থা

Agricultural System

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড গড়ে ওঠে কৃষিকে কেন্দ্র করে। অথচ জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কৃষির অবদান ক্রমেই কমে যাচ্ছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে যেখানে কৃষির অবদান ছিল ৫২.৪ ভাগ সেখানে ১৯৯০-৯৩ সালে ৪৮.৯ ভাগ। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষিখাতকে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার দেয়া হয়নি। কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ দিন দিন কমেছে। সরকারের ক্ষমতা গ্রহনের পর পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ করলেও সমবায়ী কৃষকদের কৃষিঋণ মওকুফ করেননি। জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সত্ত্বেও কৃষিখাতে ঋণ দানের হার বাড়েনি। ১৯৯০-৯১ ও ১৯৯১-৯২ সালে কৃষিখাতে ঋণদানের হার ছিল যথাক্রমে ৩ ও ৪ ভাগ। অর্থাৎ ৯০-৯১ সালে ৫৯৫ কোটি টাকা এবং '৯১-৯২ সালে ৭৭৪ কোটি টাকা। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী বছর গুলিতে কৃষিঋণের পরিমান উক্ত দু'বছরের তুলনায় দেড় থেকে দু'গুন বেশী ছিল।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯৮২ সালের তুলনায় ১৯৯২ সালে ধানের সংগ্রহ মূল্য বেড়েছে ৮৩ ভাগ। কৃষি উপকরণ থেকে ক্রমান্বয়ে ভুর্তকি তুলে নেয়ার ফলে ইউরিয়ার দাম বেড়েছে ১২৮ ভাগ, বিটিএমসি ৩৭১ ভাগ পটাশ ৪৫৩ ভাগ। কীটনাশক ১২০০ ভাগ, জ্বালানী ৩৩২ ভাগ, ফলে আজ আমন ধানের মন প্রতি উৎপাদন ব্যয় ২২৭ টাকা, উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের উৎপাদন ব্যয় ১৮৪ টাকা, "সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিবি) থেকে কৃষি উন্নয়ন ও কাঁচামালের সেচ সারের বরাদ্দ বাতিল একশত বীজ বিতরণ কেন্দ্র বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে বিএডিসির ১২,০০০ হাজার কর্মচারীর বেতন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।[২০] যেখানে গ্রামীন ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা হয়েছে সেখানে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ২২৫টির মতো শাখা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে খাদ্যশস্য আরও বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা আন্তর্জাতিক চক্রান্তের অংশ। প্রশাসনে সমন্বয় ও দিক নির্দেশনার অভাবই এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ"। মন্ত্রনালয়ের কর্তৃত্বের প্রশ্নে ঐক্যমতের অভাবে কৃষি এবং সেচমন্ত্রী মজিদুল হকের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি দুই বৎসরেও সংসদীয় সরকার পদ্ধতির সাথে সঙ্গতপূর্ণ একটি কার্যবিধিমালা খসড়া করতে পারেনি।[২১]

এই সময় চালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যায় এবং সার সংকট সৃষ্টি হয়। ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সার সংকট সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন খবর প্রকাশিত হয়। ২৩ মার্চ প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় বগুড়ার শিবগঞ্জে প্রতিবস্তা ইউরিয়া সার ১১২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। একই তারিখে নওগাঁ ও তার আশে পাশের এলাকায় প্রতিবস্তা সার ১০০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। অথচ ২১ মার্চ সারের দাম ছিল ৭০০ টাকা থেকে ৮০০শত টাকা। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ ১৯৯১-৯৫ সালের বিভিন্ন সময়ে ১২ হাজার টন ইউরিয়া সার ভূয়া কাগজ পত্রের মাধ্যমে মিলের বাইরে পাচার করা হয়।

এই সারের হিসাব মিলের কাগজপত্রে রয়েছে কিন্তু গুদামে এর অস্তিত্ব নেই। বাকী ২০ হাজার টন ইউরিয়া সারের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয় দেশের দক্ষিনাঞ্চলে ইউরিয়া সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বস্তা প্রতি ইউরিয়ার বিক্রয়মূল্য ২১৫ টাকা নির্ধারিত থাকলেও এই অঞ্চলে বর্তমানে তা ২৬০ থেকে ২৭০ টাকা বিক্রি হচ্ছে।[২২] ১৯৯৫ সালে বিএনপি সরকার আসন্ন বোরো মৌসুমে ইউরিয়া সার রপ্তানী করে প্রায় ৫৩ কোটি টাকা লাভ করে। অন্যদিকে সার

Dhaka University Institutional Repository

রপ্তানীর ফলে অভাবের জন্য কৃষকেরা জমিতে সার দিতে না পারায় দশ লাখ টন খাদ্য ঘাটতির আশংকা করা হয়। এই ঘাটতি পূরণ করতে হলে বিদেশ থেকে ১০০০ কোটি টাকার খাদ্য আমদানী করতে হবে। বৈদেশিক সাহায্য দাতা সংস্থা ইউএমএইচ এর এগ্রোবেইজড ইন্ডাষ্ট্রিজ ট্রেড বুলেটিনে এই তথ্য প্রকাশিত হয়।[২৩] ১৯৯৫ সালের ঐতিহাসিক সার কেলেংকারীর দায় দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ৪ এপ্রিল '৯৫ পদত্যাগ করেন শিল্পমন্ত্রী এ. এম. জহির উদ্দিন খান। "তবে তিনি পদত্যাগের পর সাংবাদিকদের চাল দেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে কলকারখানায় সার উৎপাদন নিশ্চিত করা সেটা যথার্থই হয়েছে। কিন্তু উৎপাদিত সার সরবরাহ ও বিতরণের অনিয়মের কারণে এ অবস্থায় সৃষ্টি হয়।"[২৪]

সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন মন্ত্রী মাজেদ উল হক কমিশনারের কাছে বলেন যে চাহিদার তুলনায় স্বল্প সরবরাহ এবং কারখানাগুলিতে মজুদের পরিমান সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসার ফলে সার সংকটের সৃষ্টি হয়। তিনি আরও বলেন মন্ত্রণালয়ের নিরূপিত চাহিদা কোন মতেই ভুল ছিল না। সার মজুত ও মিল গেটে গুন্ডামি এই সংকটের অন্যতম কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। খাদ্য মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া বিভিন্ন পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছেন যে দেশে উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্য রয়েছে। অথচ চালের কেজি তখন ১৭-১৮ টাকা। প্রকৃত ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এর এবং দলীয় লোকজনকে দিয়ে সার বিলি বন্টন ও বিক্রির ব্যবস্থা করায় সার সংকটের সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। অর্থমন্ত্রী দাবী করেন রাষ্ট্রবিরোধী লোকের সহায়তায় ডিলাররা গরীব চাষীদের বঞ্চিত করছে।

৪.৪ শিল্প ব্যবস্থা

Industrial System

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরই শিল্পকে পুন:প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করে ২২ জুলাই ৯১ জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে বেরিয়ে এসেছে যে, সরকারী ব্যাংকের ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের সম্পদ পাচার করে বেসরকারী ব্যাংক গড়ে উঠেছে। এছাড়া ৯টি বেসরকারী ব্যাংকের ৩৯ জন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও পরিচালক বিভিন্ন সরকারী ব্যাংক শিল্প ব্যাংক থেকে ৮২ লাখ ৮২ হাজার টাকা ঋণ নেয়। সরকার এমন ৫ শতাধিক প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পেয়ে তাদের অনুমোদন ও রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করে। খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন "খেলাপীদের ৩টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। মামলা করার আগে তাদের সুযোগ দেয়া হবে। ঋণ আদায়ের জন্য সকলের সহযোগিতা চাইবো,

Dhaka University Institutional Repository

নতুন উদ্যোগীদের কাছ থেকে এই টাকা আদায় করে নতুন ঋণ দেয়া যায়। এ ব্যাপারে সংসদীয় কমিটির ব্যবস্থা নেয়া যাবে।"[২৫]

জাতীয় সংসদ কেবল ব্যাংক কোম্পানী এ্যাক্ট ১৯৯১ পাশ করে ঋণ খেলাপীদের তালিকা প্রকাশ করতে শুরু করলে বিভিন্ন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এর বিরোধিতা করতে থাকে এবং পত্রিকাগুলি এর বিরুদ্ধে রিপোর্ট লেখা শুরু করে। এছাড়া অতীত আমলের মন্ত্রী এম. পি এবং বর্তমান আমলের বিএনপি ও আওয়ামী লীগের অনেক সদস্য এর সাথে জড়িত ছিলেন। প্রধান বিরোধী দলের আক্তারুজ্জামান বাবু এবং সরকারী দলের শামসুল ইসলাম খান এই দুইজন সাংসদ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এটি পঞ্চম জাতীয় সংসদের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিল। কিন্তু সংসদ শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেনি। কেননা খোদ সরকারী দল ও অন্যান্য সরকারী দলের ভিতর এসব লুটেরা শ্রেনী থাকায় তারাই এতে বাধ সাধে। বাস্তবত দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে অর্থনীতি শাসনে যারা যত নীতি নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে তারা হলো, বৃহৎ রাজনৈতিক দলসমূহ, আমলাতন্ত্র, বৃহৎ ব্যবসায়ী সংস্থা এবং বিশ্ব ব্যাংক আই এম এফসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা। আন্দোলন, নির্বাচন, পারস্পারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলির সীমিত জবাবদিহির কিছু ব্যবস্থা সৃষ্টি হলেও অন্যদের কোন রকম জবাবদিহির সুযোগ নেই।[২৬]

বিএনপি সরকারের আমলে প্রায় ৪ হাজার শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। সরকার বিভিন্ন সময়ে ৫৮ টি বৃহত্তর শিল্প এবং ১৪ টি বৃহৎ শিল্পের ৪৯% শিল্পের মালিকানা বিক্রি করেছে। সরকারের এই শিল্প বিরোধী নীতির দলে বেসরকারী পর্যায়ে ২৬০টি ছোট বড় শিল্প কারখানা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। একই সময়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ১৫ শতাধিক শিল্প কারখানা রুগ্ন হয়ে পড়ে। "সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় ৫ বৎসরে বিএনপি সরকারের বিক্রি করা সরকারী বৃহত্তর শিল্পগুলির মধ্যে ১৩টি পাট, সুতা কল ১৮টি ও অন্যান্য শিল্প ২৩টি, এই ৫৮টি বৃহত্তর শিল্পের যাবতীয় সম্পদ ও সম্পত্তির মূল্য হবে ১৬শ কোটি টাকা, পানির মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে ৫৮০ কোটি টাকায়। বিক্রিত সম্পত্তি থেকে সরকার এ পর্যন্ত পেয়েছে মাত্র ২৭০ কোটি টাকা। বাকী ৩১০ কোটি টাকা ক্রেতারা এখনো পরিশোধ করেনি। এই বিপুল অংকের সরকারী শিল্প কারখানা ও সম্পদ যাদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে তাদের অধিকাংশ বিএনপি'র মন্ত্রীবর্গ ও নেতাদের আত্মীয়-স্বজন।"[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

দেশে ক্রমাগত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অরাজকতার সৃষ্টি হলে বিদেশী বিনিয়োগ কারীরা তাদের পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয়। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে গড় বিনিয়োগের পরিমান হলো ১০ লাখ মার্কিন ডলার। ভারত পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় দলীয় কোন্দল বিদ্যমান, তথাপি সেখানে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতে বিনিয়োগের পরিমান ২০ কোটি ডলার, পাকিস্তানে ২৫ কোটি ৭ লাখ ডলার, শ্রীলংকায় ৯ কোটি ৮ লাখ ডলার। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মুজাফ্ফর আহমদের মতে শিল্পয়ানের গতি নেই বলে ব্যাংকে বিপুল পরিমান টাকা পড়ে আছে এবং অর্থনৈতিক তৎপরতা নেই বলে মুদ্রাস্ফীতির পরিমান তত কম। মুদ্রাস্ফীতির রোধে বিএনপি সরকার ১ম ৩ বৎসর সাফল্য দেখালেও ৪র্থ বৎসরেও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

বিএনপি আমলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় পাট ও বস্ত্র শিল্প। ২৯ আগষ্ট, ৯৩ সরকার বাংলাদেশ পাট শিল্প অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংকের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, এই কারণ দেখিয়ে এর বিলুপ্ত ঘোষণা করে। পাট মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায় যে, বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনের দায় দেনা ১২৫৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৯৩৩ কোটি টাকা অতীত ব্যাংক ঋণের সুদ। পক্ষান্তরে সরকারী হিসাব মতে এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদের বাজার মূল্য ৬০০ কোটি টাকারও অধিক, অধ্যাদেশটি সরকারের সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে পাশ করানো হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন এ্যাক্ট নামে আইনে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে, ৮৫ সালে বাংলাদেশ জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্ট কর্পোরেশন ও র‍্যালি ব্রাদার্স লিঃ এই ৪টি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন গঠন করা হয়। এর উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ছিল কৃষকের পাটের ন্যায্য মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান, পাটের চোরাচালান নিয়ন্ত্রন ও বেসরকারী খাতের পাট কল সমূহে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিমান ও মানের পাট সরবরাহ ও বিদেশে কাঁচাপাট রপ্তানী বিশেষজ্ঞদের মতে এর বিলুপ্তি করায় পাট শিল্পে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এই সময়ে বাংলাদেশ টেক্সটাইলস মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি) ৫৩০ কোটি ৩৪ লাখ ৩৯ হাজার টাকা লোকসান দেয়। সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। হিসাব অনুযায়ী সংস্থাতে বৎসরে লোকসান দিয়েছে ৭৪ হাজার ৪৪ কোটি ৮৫ লাখ ২৩ হাজার টাকা। অর্থাৎ বিএনপি সরকারের শাসন

Dhaka University Institutional Repository

আমলের পূর্বে ১৮ বছরে সংস্থা গড়ে লোকসান দিয়েছে ১৪ কোটি ৬০ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। নিম্নে ৪১টি মিল নিয়ে গঠিত সংস্থার লাভ ক্ষতির হিসাব তুলে ধরা হলো: (১ম ও ২য় সংসদীয় সরকারের আমলের)।

সারণী ঃ ৪.৬

অর্থ বছর	লাভ	লোকসান
১৯৭২-৭৩	৬,১৯,৪৯,০০০	-
১৯৭৩-৭৪	১১,৯০,৩৯,০০০	-
১৯৭৪-৭৫	১২,৬৬,৫১,০০০	-
১৯৭৫-৭৬	৩,৪৫,১৭,০০০	-
১৯৯১-৯২	১৫,০৯,০০০	৫৫,২০,১০,০০০
১৯৯২-৯৩	-	১,৪৪,৫২,৯৭,০০০
১৯৯৩-৯৪	-	১,৫৩,৮২,৩০,০০০
১৯৯৪-৯৫	-	১,১৯,২৮,৯৯,০০০

সূত্র ঃ মানচিত্র ২০ অক্টোবর, ১৯৯৫।

দেশ স্বাধীন হবার পর সংস্থা ৪১ টি শিল্প নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বিএনপি আমলে মিলগুলি রেকর্ড পরিমান লোকসান দেয়ায় সরকার ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে ১০ টি এবং ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ১ টি মোট ১১ টি লে-অফ ঘোষণা করে পরবর্তীতে পানির দামে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত করে। ফলে ১০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এরপর আরও ১১ হাজার শ্রমিক ছাটাই করা হয়। তাতে তাদের পরিবার পথে বসে যায়। বিটিএমসির অব্যাহত লোকসানের জন্য ওয়াকিবহাল সংশ্লিষ্ট মহল প্রচলিত সরকারের বিকল্পনীতিকে দায়ী করে থাকেন। উক্ত মহল একই মাসে মিলের অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করছে।

বিশ্ব ব্যাংক ও এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) মাসে বিএনপি সরকারের আমলে যে পরিমান প্রকল্প সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে তার মধ্যে মাত্র এক চতুর্বিংশ ব্যয় করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সংক্রান্ত বিভাগের সূত্রে জানা যায় যে ১৯৯১ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১৯৯৫ সালের ৩১ জুলাই

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত ৪ বছর ৩ মাসে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ৪ হাজার ৯১৪ কোটি ৫৮ লাখ ৩০ হাজার টাকা এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ১৭০ কোটি ৩৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

শিল্প খাতের উন্নতি ব্যতীত সমষ্টিক অর্থনীতির উন্নতি অসম্ভব। অথচ বাংলাদেশে এ খাতটি আজ পর্যন্ত অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করতে পারেনি। শিল্প খাতের অবদান অর্থনীতিতে এখন কম। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ম্যানুফেকচারিং খাতের অবদান ১৯৬৯-৭০ সালে ৭.৫৮%, ১৯৮৬-৮৮ সালে ৮.৮%, ১৯৮৮-৮৯ সালে ৮.৪% এবং ১৯৯০-৯১ সালে ৮.৭৮% শতাংশ ছিল। এই খাতের অবদান অবশ্য ১৯৯১-৯২ সালে ৯.১%, ১৯৯২-৯৩ সালে ৯.৭% এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে ৯.৯% শতাংশে উন্নীত হয়েছে।[২৮] বর্তমানে প্রাইভেট ও পাবলিক খাত মিলে ম্যানুফেকচারিং খাতের অবদান ১২ শতাংশের কাছাকাছি এসেছে। সরকারী খাতের শিল্পগুলো অধিকাংশ রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়েছে। যে গুলি চালু আছে তারাও ক্রমাগত লোকসান দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সার্ভে এন্ড ষ্টাডিজ প্রোগ্রাম ১৯৯৩-৯৫ এর অধীন ২২৭ টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ৭,৩৬৬ টি ইউনিটে মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৭৬ থেকে ১০০ শতাংশে ব্যবহার করা হয়। এর ফলে শিল্প খাতের উৎপাদন দাঁড়ায় ৬৯ শতাংশে। বাদবাকীগুলোর উৎপাদন হচ্ছে শূন্য থেকে ২৫ শতাংশ। সামান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুরো উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থেকে যায়। তৈরী পোশাক খাতে উৎপাদনের তেজীভাব বজায় থাকলেও ৮২ শতাংশের উপরে উঠতে পারেনি। বেশীর ভাগ শিল্পই গড়ে ৫০ শতাংশের কম উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগানো হয়।[২৯]

৪.৫ দারিদ্র্য দূরীকরণ

Poverty Alleviation

বাংলাদেশের দারিদ্র্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনেক গবেষণা জরীপ হয়েছে। ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) বিভিন্ন সরকারের আমলের দারিদ্র্য পরিস্থিতির এবং এটি দূরীকরণে কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে বেশকিছু গবেষণা ও জরীপ করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্বব্যাংক, বিবিএস, আইএলও, ইউএনডিপি, আইএমএফ প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা জরীপ থেকে এ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) এর বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে বলা হয় বিগত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কার্যত: কোন অগ্রগতি হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা মোটেই অর্জিত হয়নি। প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল সঞ্চয়ে স্বল্পতা, সরকারী খাতে বিনিয়োগের ব্যর্থতা। বিগত কয়েক বছরে কৃষিখাতে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এর পিছনে মূল কারণ হলো উদার আমদানী নীতি। তবে কৃষিতে শস্য বৈচিত্রকরণ সম্ভব হয়নি। কয়েকটি খাতে শিল্পোৎপাদন ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে। মুদ্রা বিনিময় কঠোর হবার কারণে তৈরী পোশাক রপ্তানী কিছুটা উন্নতি হলেও পাটজাত দ্রব্য মার খাচ্ছে।[৩০]

১৯৯৩ এর ৮মে বিআইডিসি এর এক জরিপ রিপোর্টে বাংলাদেশ অর্থনীতিবিদদের সম্মেলনে বলা হয় যে "Bangladesh has been fortunate during this entire period in having an unbroken series has good hervests" ক্রমাগত ফসল উৎপন্ন হবার জন্যই মাঝারী কৃষিতে উন্নতি প্রসঙ্গের কথা বলা হয়েছে। তবে তারা বলেন যে, "The proportion of house holds in extreme poor status has remain largely unchanged" কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকের সার্বিক পরিস্থিতির কোন উন্নতি হচ্ছে না।[৩১]

'৯২-৯৩ অর্থবছরে সার বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৬.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন, '৯৩ এর মার্চ পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে ১৬.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন। '৯১-৯২ অর্থ বছরে একই সময়ে সার বিক্রি হয় ১৯.১ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থাৎ সার বিক্রির পরিমান তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে। '৯১-৯২ অর্থ বছরে গমবীজ বিতরন করা হয়েছিল ৩১ হাজার ১৬ মেট্রিক টন। '৯২-৯৩ অর্থ বছরে এই বিতরনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮.৩ হাজার মেট্রিক টন। এতে কৃষকেরা পর্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন করতে পারেনি ফলে খাদ্য ঘাটতির পরিমান দাঁড়ায় ১০ লক্ষ টনের মত। এতে খাদ্য শস্যের দাম বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী মাথাপিছু খাদ্য প্রাপ্তির পরিমান বার্ষিক ১.৫৮ কেজি থেকে ১.৬৪ কেজিতে হ্রাস পায়। প্রধানমন্ত্রী ৯৪ সালে চালের কেজি ১১ টাকায় নামিয়ে আনতে বলেন। অথচ তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫/১৬ টাকা। ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ করার কথা বলা হলেও তা কার্যকরী করা হয়নি। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিএনপি সরকার ১৯৯১ সালের ২৫ জানুয়ারী পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহারে খালখনন কর্মসূচীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। উক্ত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া খাল খনন কর্মসূচীকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অধীনে সরাসরি এনে তার দেখাশুনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিজেই বহন করেন। উল্লেখ্য '৮১ সনের ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো এবং বন্যা জলাবদ্ধতা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে শহীদ

Dhaka University Institutional Repository

জিয়া খাল খনন প্রকল্পের কাজ শতকরা ৭৫ ভাগ স্বেচ্ছাশ্রমে বাকীটা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় শুরু করেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ঐ স্বেচ্ছাশ্রম কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে সেই কাজে সফল হয়েছিল। খালেদা জিয়া সরকার এই কাজে তেমন সফল হতে পারেনি। বরং খাল খনন কর্মসূচীর নামে খরচ হয়েছে কোটি কোটি টাকা যেটি ছিল রাষ্ট্রের একটি বিরাট অপচয়। প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকার এই ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে এমপিদের কাছে লেখা চিঠিতে বলেন যে, "বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে স্বেচ্ছাশ্রমের অংশ কমিয়ে শতকরা ৫০ ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু বিগত বছরে এই কর্মসূচীতে সর্বস্তরের জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। জন প্রতিনিধিদের সহযোগিতা ছাড়া খাল খনন কর্মসূচী সফল করা সম্ভব নয়। খাল খনন কর্মসূচী সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক গণজাগরন সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে আপনি অগ্রনী ভূমিকা পালন করবেন এবং আপনার সক্রিয় সহযোগিতায় আপনার এলাকায় এই কর্মসূচী সফল হবে"।[৩২]

বিএনপির ৫ বৎসরে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহ অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। ঋণ প্রবৃদ্ধি স্বীকার হয়ে আর্থিক খাত এখন হাবুডুবু খাচ্ছে। কলমানি মার্কেটিং ব্যাংক রেট ২০-২৫ শতাংশে উঠেছে। মুদ্রাস্ফীতির হার ৯ শতাংশের ওপরে গিয়ে উঠেছে। ভুয়া কাগজপত্র ও নামে বেনামে ঋণ নেওয়ার ঘটনা এরশাদ আমলের চেয়ে বেশী ঘটেছে। এরশাদের '৮১-৮২ অর্থ বছর থেকে '৯০-৯১ অর্থ বছর পর্যন্ত ১০ বৎসরে ঋণ স্থিতিশীল ছিল ২৪ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা। আর্থিক ঋণ প্রবৃদ্ধির পরিমান ছিল ২০ হাজার ছয়শ ২০ কোটি টাকা। অপরদিকে '৯১-৯২ অর্থ বছর থেকে '৯৪-৯৫ অর্থ বছর পর্যন্ত ৪ বছরে ঋণ স্থিতি ২৪ হাজার ৪'শ ৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৯ হাজার কোটি টাকা। আলোচ্য পাঁচ বছরে ঋণ প্রবৃদ্ধির পরিমান ১৪ হাজার ৫'শ ২৫ কোটি টাকা। পরবর্তী '৯৫-৯৬ অর্থ বছরের শুরু থেকে বিদায়ের আগ পর্যন্ত এ ঋণের পরিমান বৃদ্ধি পায় ৩৫০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিএনপির ৫ বছরে ১৮ হাজার কোটি টাকায় ঋণ বিতরন করে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করা হয়েছে। কিন্তু শিল্পায়নে তার ছাপ পাওয়া যায়নি। ঋণ দাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর খাতা কলমে ঐ পরিমান ঋণ দেয়া হয়েছে কিন্তু সেটা কোথায় কিভাবে ব্যয় হয়েছে, রিটার্ন কি এসব হিসাব কমই আছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। বিতরনকৃত ঋণের সিংহভাগই ব্যাংক তহবিলে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। '৯১ সালে ক্ষমতায় এসে সরকারের অর্থমন্ত্রী এরশাদের শাসন আমলে ব্যাংকিং খাতে লোপাটের বিরুদ্ধে হুংকার দেন। ঋণ খেলাপীদের নামের তালিকা প্রকাশ করে পত্রিকায়। আইনকানুন কঠোর করা হয়। অর্থ ঋণ আদালতও

Dhaka University Institutional Repository

গঠন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এর কোন প্রয়োগ করা হয় নাই।[৩৩] ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (আইএফডি) সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের ১৪৪ টি দরিদ্র দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান পঞ্চম। তাদের মতে গ্রামীন জনগনের ৮৬% দরিদ্র এবং শহরাঞ্চলে দরিদ্রের সংখ্যা ৫৩ ভাগ।[৩৪] বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্য নিরূপনের জন্য ঢাকাস্থ বিআইডিএস "1987-94 Dynamics of rural poverty in Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষণা জরীপ পরিচালনা করে। উক্ত জরীপের গবেষণায় Analyses of poverty trend project, 62 Village Re-survey, 1995 অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিবেদনটির সার-সংক্ষেপে মূল গবেষণা প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যায়। এ চিত্রে বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্যের যে অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয় আশির দশকের চেয়ে ৯০ এর দশকে বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্যের অবস্থার উন্নতি ঘটেছে।[৩৫] আয় পরিমাপের বিচারে গ্রামীন দারিদ্র্য জনসংখ্যা ১৯৮৭ সালের ৫৭% থেকে ১৯৯৪ সালে ৫১.৭% হ্রাস পায়। মাঝারী দারিদ্র্য ১৯৮৭ সালে ৩৭.৭% থেকে ১৯৯৪ সালে ৩৯.২% এবং অনপেক্ষ দারিদ্র্য ২৫.৮% থেকে ২২.৫% নেমে আসে। গ্রামীন অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস একটা মস্ত বড় ঘটনা। এটা ঘটেছে গ্রাম থেকে মানুষ চলে আসার জন্য এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসের জন্য।[৩৬] ইউএনডিপি সর্বশেষ মানব উন্নয়ন রিপোর্টে (১৯৯৫-৯৬) এ উল্লেখ করা হয় যে বাংলাদেশের লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ছয় কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। বিএনপি সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণে '৯৪-৯৫ অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করে ২০ কোটি টাকা কিন্তু সংশোধিত বাজেটে তা দাঁড়ায় মাত্র ৫ কোটিতে। বিশেষজ্ঞদের মতে বেগম জিয়ার ডাল-ভাতের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হলে প্রবৃদ্ধির হার করতে হবে ৯ শতাংশ এবং জাতীয় আয়ের ৩৬% করতে হবে বিনিয়োগ। বেকারের সংখ্যা প্রায় দুই কোটির উপরে। তাদের কর্মসংস্থানের তেমন কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। বরং গোল্ডেন হ্যান্ডসেকের নামে ৩৫টি পাটকলের এক লাখ শ্রমিককে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয় অতিরিক্ত এই অজুহাতে। এই শ্রমিক ছাঁটাই এর প্রভাব পড়েছে অর্থনীতির উপর। এ প্রসঙ্গে Asia development outlook (ADO) '৯২- তে বলা হয়েছে যে, "Enormous national Economic Loss in terms of Economic opportunities forgone due to lengthy delays interms of Economic decisions in project implementation."[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ সালের ২৪ জানুয়ারী বিনিয়োগ বোর্ড ও লন্ডন ভিত্তিক প্রকাশনা ইউরোমানি যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে যার মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশী বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য সম্ভাব্য খাত সনাক্ত করা। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের এত বড় সম্মেলন এই প্রথম হলো। এর অন্যান্য উদ্দেশ্য ছিলো ঢাকা শেয়ার বাজারের সম্ভাবনা পর্যালোচনাসহ আঞ্চলিক বাজারগুলির সাথে তুলনা এবং বেসরকারী কর্মসূচীসহ যৌথ পুঁজি বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো দীর্ঘ ৪০ বৎসর পর চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ চালু করা।[৩৮] এই বছর ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে সরকার তৎপর ছিলো। এজন্য ব্যাংকের কয়েকজন পরিচালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। যেমন সমগ্র নির্বাচনে তারা যাতে অংশগ্রহন করতে না পারে। এছাড়া বেশকটি নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন প্রাইম ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, সাউথ ইষ্ট ব্যাংক এবং ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক। এগুলি ছিল বিএনপি সরকারের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যোগ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রয়োজন হল সুষ্ঠু অর্থনৈতিক নীতিমালা। প্রশাসনে সমন্বয়, সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সুসম্পর্ক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা মোট কথা গণতান্ত্রিক পরিবেশ যেটি পঞ্চম জাতীয় সংসদে দেখা যায়নি।[৩৯]

৪.৬ শিক্ষা ব্যবস্থা

Education System

নিরক্ষরতা বা অল্পশিক্ষা দারিদ্র্যের সঙ্গী। এই দুটি অবস্থা সাধারণত একই সঙ্গে বিরাজ করে। শিক্ষার স্বল্পতা হেতু দারিদ্র্য সৃষ্টি হয় ও বৃদ্ধি পায়। এ জন্য নিরক্ষরের হার অধিক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার সকল দেশের অনেক পিছনে পড়ে আছে। শিক্ষা শক্তি যোগায় ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারে। একজন গরীব শিক্ষার মাধ্যমে তার জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারে। বুঝতে পারে তারা, কিভাবে তাকে শাসন ও শোসন করছে। দ্বিতীয়ত শিক্ষা গরীবের কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা করে আয়ের পথ সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য এ শিক্ষা যে সর্বত্র প্রাতিষ্ঠানিক ও পুথিগত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। গরীবের জন্য এমন শিক্ষা প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে যা তাদের আয় ও উন্নতির পথ সুগম করতে পারে। বয়স্ক শিক্ষা ও শিশু শিক্ষা কার্যক্রম ভিন্নভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার।[৪০] বিএনপি সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন না আনতে পারলেও নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহন করে। অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং মেয়েদের জন্য এই শিক্ষা ফ্রি করা হয়। প্রাইমারী পর্যন্ত খাতা কলম স্কুল থেকে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। বিআইডিএস এর

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ সালে ৬২টি গ্রাম পুন:জরিপ তথ্যে জানা যায় যে ১৯৯০-১৯৯৫ সালে ৬-১০ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ৫৬ থেকে ৭০ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্র ছাত্রীর বৈষম্যের হার ১৯৯০ সাল থেকে কমে ১৯৯৫ সনে নেই বললেই চলে। অবশ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ততটা বাড়েনি, যা মাত্র ২% ধরা যায়। ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি এ পর্যায়ে পূর্বের মতই ব্যাপক।[৪১]

দ্বিতীয় সংসদীয় সরকারের আমলে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় করা হয় এবং প্রতিটি বাজেটেই এখাতে বেশী ব্যয় ধরা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা লাভবান হয়নি। কেননা ক্যাডেট কলেজগুলোতে ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির যে কথা আগে বলা হতো এবং বিএনপি সরকারও সেই কথা বলছে, তা মূলত ব্যয় হয়েছে একদিকে ধর্ম শিক্ষা অপরদিকে ক্যাডেট কলেজ মডেল কলেজ ইত্যাদির খাতে। মাদ্রাসা মসজিদ ইত্যাদির সংখ্যা স্বাধীনতার পর থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ঢালাও ভাবে এক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এতে আধুনিক কারিগরি বা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বিকাশে গুরুত্ব রাখে না। বর্তমানে ছাত্র শিবির ও জামাতে ইসলামীর যে শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে তার মূলে আছে শিক্ষা খাতে সরকারের এই ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি। এই ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক জীবনের এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার বিকাশের সাথে সম্পর্কিত কোন শিক্ষার বিস্তার ঘটে না এবং এই পরিস্থিতিতে দেশের জনগন সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন। কিন্তু তারা ক্ষতিগ্রস্থ হলেও লাভবান হন ধনীক শ্রেনীর লোকেরা এবং তাদের আন্তর্জাতিক রক্ষক সাম্রাজ্যবাদ।[৪২]

বিশ্বব্যাংকের মতে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ করা হলেও এই খাতে সেবার মান বাড়েনি। শিক্ষা খাতের সমীক্ষায় বলা হয়েছে পাঁচ শতাংশ শিক্ষকই অনুপস্থিত থাকেন এবং ১০০ জনের উপস্থিত থাকেন ১ জন শিক্ষক, এই সময়ে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কমেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সন্ত্রাস দূর করার জন্য সংসদে প্রস্তাব আনার পর সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয় সরকারী দলের তালিকা বিরোধী দল তৈরী করবে আর বিরোধী দলের তালিকা সরকারী দল তৈরী করবে। এই প্রস্তাবের পর সেই কমিটিকে আর কাজ করতে দেয়া হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ এবং আন্দোলনের গতিধারা ও প্রকৃতি

The Caretaker Government and the Course and nature of the Movement

পঞ্চম জাতীয় সংসদে যে বিষয়টি বেশী আলোচিত হয়েছে তা হলো সাংবিধানিকভাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী। বিরোধী দলগুলি এই দাবী উত্থাপন করে। কিন্তু সরকারী দলের পক্ষ থেকে প্রথম দিকে এই দাবীর প্রতি ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় উভয়ের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত সংসদকে অকার্যকর করে দেয়। এই দাবী উত্থাপনের পিছনে দু'টি কারণ কাজ করে। (ক) মাগুরা উপনির্বাচনে ব্যাপক ভোট ডাকাতি ও কারচুপি। এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে কাজ করেছে। (খ) অপরটি হলো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান, যেটি পরোক্ষ কারণ হিসেবে কাজ করে। নিম্নে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

404207

ক. প্রত্যক্ষ কারণ (মাগুরা উপনির্বাচন- ২)

বিএনপির আমলে দুটি উপনির্বাচন এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের মেয়র ও ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ জানুয়ারী '৯৩ অনুষ্ঠিত ঢাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কাছে বিএনপির প্রার্থী পরাজিত হয়। বিরোধীদল এই নির্বাচনে কারচুপির কোন অভিযোগ আনয়ন করেনি। ১৯৯২ সালের ৪ নভেম্বর সংসদ সদস্য হারুন মোল্লা মারা যান। তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেনকে পরাজিত করে নিরপুর ১১ এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী এই আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মহসীনের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামাল মজুমদার। এই নির্বাচনে বিএনপির প্রাথী ৮০,১২৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য কোন সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেনি তবে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু উত্তেজনা, সংঘর্ষ, সংঘাত ভোটারদের হয়রানি এবং কিছু জায়গায় জাল ভোট দেয়া হয়। বিরোধী দলগুলি এই নির্বাচনে ফল গননায় কারচুপির অভিযোগ আনে। অর্থাৎ তাদের মতে তাদের প্রার্থীকে জোর করে পরাজিত করা হয়েছে। রাত ৮টায় ঘোষিত ফলাফলে ১০৫টি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিপুল ভোটে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু এরপর অজ্ঞাত কারণে ফলাফল স্থগিত ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে নির্বাচন কমিশন তাদের পাওয়া ফলের বিপরীতে ঘোষণা দিতে আপত্তি জানালেই বিপত্তি ঘটে। নির্বাচনের পরের দিন সরকারী ভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা সম্পর্কে "হাসিনা বলেন, এই আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিজয় ছিল সুনিশ্চিত। বিএনপি সরকার মিডিয়া ক্যু করে এই বিজয় ছিনিয়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েছে। ১৮টি কেন্দ্রে পুন:নির্বাচন দাবী করে তিনি বলেন, নির্বাচনের পর ৭৮টি কেন্দ্রের ফলাফল নির্বাচন কমিশন জানতে পারে। এই ফলাফলে আমাদের আপত্তি নেই। জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে বিভাগীয় কমিশনারকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে এবং ডিএমপির কমিশনার হাবিবুল হুদার সাহায্যে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করা হয়েছে।"[৪৩]

ঢাকার সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগ ভেবেছিল মিরপুর আসনে তাদের প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত। অন্যদিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর বিএনপি মনে করেছিল মিরপুর উপনির্বাচনে পরাজিত হলে দেশ শাসন করা তাদের জন্য সম্ভব হবে না। অতএব যেকোন উপায়েই হোক এই নির্বাচনে তাদের জয়লাভ করতে হবে।

মিরপুর নির্বাচনের পর বিরোধীরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করলেও মাগুরা উপনির্বাচনের আগ পর্যন্ত তা জোড়ালো আকার ধারন করেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি আন্দোলনে রূপ নেয় ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত মাগুরা দুই আসনের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে। নির্বাচনের পূর্বে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছিলেন "উপনির্বাচন যাতে সুষ্ঠ ও শান্তি পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে সে জন্য নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়ে অস্থায়ী ভাবে মাগুরায় স্থানান্তর করা হয়। ভোট গ্রহনে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনী এলাকার আওতাধীন প্রতিটি ইউনিয়নে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, চারটি রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্য ও নেতৃবৃন্দের সমবায়ে দুটি করে ভ্রাম্যমান টীম গঠনের ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন এই টীম গুলো ভোটগ্রহন কালে ভোট কেন্দ্র পরিদর্শ করে কমিশনারের নিকট সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করবে। মধ্যাহ্ন ভোজের পর অনুষ্ঠিত আলোচনাকালে বিএনপির নির্বাচন কার্যালয় টীম গঠনের অসংগতি জানায়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সন্ধ্যা ছয়টায় সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে ঘোষণা দিয়েও শেষ পর্যন্ত হঠাৎ করে নির্বাচন কমিশনের লোকজন সহ মাগুরা ত্যাগ করেন।"[৪৪]

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ভোট গ্রহনকালে নজিরবিহীন সংঘর্ষ, বোমাবাজী, গোলাগুলি, আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ভয়ভীতি, জীবন নাশের হুমকি প্রদর্শন, পেশী ও অস্ত্র বলে ভোট কেন্দ্র দখল ইত্যাদি নির্বাচন বিধি লংঘনের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় কমপক্ষে ৫০ ব্যক্তি আহত হয় এবং ভোট গ্রহন শেষে ১০ জনকে আশংকাজনক ভাবে মাগুরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐ আসনের আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী শফিকুল হাসান বাচ্চু সাংবাদিকদের বলেন নির্বাচন কমিশনের ওয়াদা অনুযায়ী ভোট

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রগুলোতে বিডিআর মোতায়েন না করার কারণে বিএনপির মন্ত্রী এমপিরা ৪/৫টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সসস্ত্র সন্ত্রাসীসহ অধিকাংশ ভোট কেন্দ্র দখল করে নেয়। এসব ভোট কেন্দ্রে নজিরবিহীন সন্ত্রাস চলাকালে নির্বাচনে দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেটদের পক্ষে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব পর হয়ে উঠেনি। কেননা প্রতি তিনটি ভোট কেন্দ্রের জন্য একজন করে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হলেও তাদেরকে গাড়ী দেয়া হয়নি। ফলে তারা তাৎক্ষনিক ভাবে ঘটনাস্থলে যেতে পারেননি।[৪৫]

আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়েছিল। '৯১ সালে তিনি ৬১,৭২৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৪ সাল থেকে এযাবৎ মাগুরায় অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী পরাজিত হননি। ভোট গ্রহন শেষ হওয়ার পরই বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন "মাগুরা মুহাম্মদপুর, শালিকা নির্বাচনী এলাকায় ভোট কারচুপি করে বিএনপি সর্বকালের রেকর্ড ভেঙ্গে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে"। প্রধান নির্বাচন কমিশনারও সব কিছু বুঝে শুনে মাগুরা এসে ঢাকায় ফিরে গেলেন। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন না করে তার এই চলে যাওয়াকে আমরা কিসের ইঙ্গিত বলে মনে করবো। তিনি এই আসনে পুন:নির্বাচন দাবী করেন।

অনেক গুলো ভোট কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন বিএনপি দলীয় কর্মীরা অস্ত্রের মুখে আওয়ামী লীগ এজেন্টদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত সীলমেরে ব্যালট পেপার বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে তিনি প্রতিবাদ সভা বিক্ষোভ ও হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করে বলেন জনগনের মৌলিক অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে আজ থেকে আন্দোলন শুরু হলো।[৪৬]

মাগুরা উপনির্বাচনে বিএনপির কারচুপির ফলে কয়েকটি ঘটনার সৃষ্টি হয় যেটি পরবর্তী নির্বাচনে বিএনপির পরাজয়ের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। নিম্নে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত ঃ একটি নির্বাচিত সরকার যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় এসেছে তারা ১৯৮৬ সালে এরশাদ যেভাবে নির্বাচন করেছে ঠিক সেভাবে স্বৈরাচারী কায়দায় নির্বাচন করে অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছে।

দ্বিতীত ঃ এই নির্বাচনে সরকারী প্রশাসন ও রাজনৈতিক শক্তিকে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে নির্বাচনী কারচুপির একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। ফলে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে প্রশাসনের উপর কি রকম হস্তক্ষেপ হতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত ঃ এই প্রথম প্রকাশ্যে এবং সব ধরনের নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে এবং আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে সরকার জেল থেকে সাজাপ্রাপ্ত খুনী ও সসস্ত্র ক্যাডারদের বের করে এনে নির্বাচনের কাজে লাগিয়েছে।

চতুর্থত ঃ এই প্রথম কোন নির্বাচনী ময়দান থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পালিয়ে আসতে হয়েছে।

"মাগুরা উপনির্বাচনে বিএনপি যে ধারা সৃষ্টি করেছে তার মোদ্দা কথা হলো, ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনের ফলাফল আগে নির্ধারণ করে নির্বাচনে যেতে পারে এবং এই পূর্ব নির্ধারিত ফলাফল প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন বেআইনী অর্থনৈতিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে। বিএনপি প্রতিষ্ঠিত এই ধারা বর্জন করতে হবে। দলীয় সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচন নয়, নির্দলীয় ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই নির্বাচন হতে হবে এবং এটাই রাজনৈতিক বাস্তবতা"।[৪৭]

১৯৯১ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের আসাদুজ্জামান পেয়েছিলেন ৬১,৭২৯ ভোট এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি বিএনপির মেজর জেনারেল (অবঃ) মজিদ-উল-হক পেয়েছিলেন ৩১,৫৯০ ভোট। অন্যদিকে বিএনপি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে (একই আসনে) বিএনপির কাজী সলিমুল হক কামাল পান ৭৩,৬২৩ ভোট এবং আওয়ামী লীগের শফিউজ্জামান বাচ্চু পান ৩৯,৬২৩ ভোট। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অথচ এই নির্বাচনে যদি সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতো তাহলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য বিরোধীদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি জনগনের কাছে তেমন গুরুত্ব পেতনা। কিন্তু মাগুরা উপনির্বাচনে বিএনপির যে কোন উপায়ে জয়লাভের চেষ্টা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীকে জোড়ালো করে এবং এই দাবীর ভিত্তিতে বিরোধী দলগুলির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে সংসদ বর্জনের একটি ভাল ক্ষেত্র তৈরী করে দেয়। কেননা তারা ত্রয়োদশ অধিবেশনে থেকেই সংসদ বর্জন শুরু করে তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদার একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে।

খ. পরোক্ষ কারণ ঃ (সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান)

বাংলাদেশে এই ধারণা এখন স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনই সুষ্ঠু ও অবাধ হবে না। কেননা এ পর্যন্ত যে কয়টি সরকার গঠিত হয়েছে তাদের অধীনে কোন নির্বাচনই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি। তবে '৯১ এর সংসদীয় সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ায় এই সরকার নিয়ে সকলের অন্যরকম প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু এই

Dhaka University Institutional Repository

সরকারও গতানুগতিক সরকারের মত আচরণ করে। যেমন এই সরকারের আমলে একমাত্র প্রথম নির্বাচন হিসেবে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এতে দুটি বড় বিভাগে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিজয় লাভ করে। এই নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানীকে মুছার জন্য বিএনপি পরবর্তী সকল নির্বাচনকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। যেমন মিরপুর ও মাগুরা উপনির্বাচনে কারচুপি ও সরকারের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসী তৎপরতা, যশোরে উপনির্বাচনে কৌশলগতভাবে পুরানো পরাজিত প্রার্থীকে হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা এসবই হয়েছে ক্ষমতাকে আকড়ে থাকার গতানুগতিক প্রবনতা থেকে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ জোট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা

ব্যাপক রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উক্ত সরকারের দাবিতে পঞ্চম সংসদের তিন বিরোধী শক্তি আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামী একজোট হয়। সর্ব প্রথম জামাতের শেখ আনসার আলী এই সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদে বিল উত্থাপনের চেষ্টা করলে সরকার বাধা দেয়। পরে এটি সাবজেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। এই কমিটি প্রস্তাবটির আইনগত বিবেচনার জন্য সংসদে প্রেরণ করে। কিন্তু সংসদ বিলুপ্তি পর্যন্ত প্রস্তাবটি আর ফিরে আসেনি। এরপর আওয়ামী লীগ এর আবদুর রহিম এম. পি. জাতীয় পার্টির মনিরুল হক চৌধুরী এমপি বিল উত্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এর প্রতিবাদে তিনজোট সম্মিলিত ভাবে, অবরোধ, বিক্ষোভ, লাগাতার সংসদ বর্জন, হরতাল, ভাংচুর, সন্ত্রাস, প্রভৃতির মাধ্যমে সরকার পতনের আন্দোলনে নামে। ১৯৯৪ সালের ২৭ জুন বিরোধী দল সম্মিলিতভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে। ঐ ঘোষণায় বলা হয়-

ক) একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

খ) রাষ্ট্রপতি ঐ অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার জন্য সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলসমূহের পরামর্শক্রমে একজন নির্দলীয় গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করবেন এবং সেই প্রধান উপদেষ্টা সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ) ঐ অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন ও নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন।

ঘ) অন্তবর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধান প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধুমাত্র জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ঙ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

চ) সংসদ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তবর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে।**

সরকারী দল কর্তৃক বিরোধী দলের প্রস্তাব প্রত্যাখান ও নিজস্ব রূপরেখা ঘোষণা

বিরোধীদলের উক্ত রূপরেখা সরকারী দল কর্তৃক প্রত্যাখান করা হয়। কারণ এতে দুটি বিষয় ছিল যেটি গণতান্ত্রিক ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

** "তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা," **দৈনিক সংবাদ**, ১৯৯৪।

প্রথমত ঃ মনোনয়ন দানের প্রথা গণতান্ত্রিক রীতি নীতির বিরোধী।

দ্বিতীয়ত ঃ ঐ প্রস্তাবের ২নং ধারায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে বিরোধী দলগুলির মনোনীত প্রার্থী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করবেন এবং সরকারী দলের এতে কোন ভূমিকা থাকবে না। এটি কোন মতেই গ্রহনযোগ্য ছিল না।

সরকারী দলের প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে স্বপদে বহাল রেখে সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ৩০ থেকে ৪৫ দিন পূর্বে তার নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারী দলের পাঁচজন সাংসদ এবং বিরোধীদলের পাঁচজন সাংসদের সমন্বয়ে অন্তবর্তীকালীন ক্ষুদ্র মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের কারও সরাসরি অধীনে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থাকবে না। মন্ত্রণালয়গুলো পরিচালিত হবে মন্ত্রিসভার যৌথ নেতৃত্বের ভিত্তিতে। তবে মন্ত্রণালয়গুলোর দৈনন্দিন নিয়মিত কাজের ক্ষমতা থাকবে সচিবদের হাতে। তারা

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মিত দাপ্তরিক কাজ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনার জন্যও পাঠাবেন। মন্ত্রিপরিষদের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী তার নির্বাচনী বা কাষ্টিং ভোট দেয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন না। মন্ত্রিপরিষদ প্রয়োজন বোধে যে কোন বিষয়ে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং সে সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবদের কাছে কার্যকর করার জন্য পাঠানো হবে। সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবগন যৌথভাবে মন্ত্রিপরিষদের কাছে জবাবদিহি করবেন, কোন একজন একক মন্ত্রির কাছে নয়। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা জাতীয় সংসদের নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী দেশের সর্বত্র তাঁর দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযান করতে পারবেন।

কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের অন্য সদস্যরা নিজ নির্বাচনী এলাকার বাইরে অন্যকোন প্রচারাভিযানে অংশ নিতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্যরা নির্বাচনী প্রচারাভিযানে যানবাহনসহ রাষ্ট্রীয় কোন সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে প্রধানমন্ত্রী তার নিরাপত্তা সম্পর্কিত যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাবেন।[৪৮]

সরকারী দলের উক্ত প্রস্তাবটিও বিরোধী দল কর্তৃক প্রত্যাখান করা হয়। এর পিছনে মূলত তিনটি কারণ ছিলো:

প্রথমত ঃ উক্ত রূপরেখাটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না;

দ্বিতীয়ত ঃ প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সকল মন্ত্রী দফতর বিহীন হওয়ায় অন্তবর্তীকালীন রাষ্ট্র পরিচালনায় অচলাবস্থা এবং প্রশাসনে জবাবদিহিতা শূন্য অবস্থার সৃষ্টি হবে।

তৃতীয়ত ঃ প্রধানমন্ত্রী কার্যনির্বাহিক ভাবে ক্ষমতাহীন হয়েও তিনি সরকার প্রধান হিসেবে সংসদের নির্বাচনের ফলাফল নিজের দলের অনুকূলে নিতে পরোক্ষভাবে প্রশাসনসহ নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করতে পারেন।

এরপর বিরোধী দল ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৪ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চুড়ান্ত রূপরেখা পেশ করে। যেটি নিম্নরূপ ছিল।

ক) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে পদত্যাগ করতে হবে।

খ) পঞ্চম জাতীয় সংসদ বাতিল করে অবিলম্বে নতুন জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ) রাষ্ট্রপতি একটি অন্তবর্তীকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি অথবা একজন নির্দলীয় গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তার কার্য পরিচালনা করবেন। অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করবেন।

ঘ) অন্তবর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে বর্ণিত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনসহ শুধু জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ঙ) সংসদ নির্বাচনের অব্যবহিত পরে সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩নং দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তবর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে।

চ) আগামী নির্বাচনের পর গঠিত নতুন জাতীয় সংসদ সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনীর মত একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে উপরোক্ত ব্যবস্থাকে আইন সম্মত করবে এবং একই সাথে ভবিষ্যতে আরও অন্তত: তিনটি সাধারণ নির্বাচন এরূপভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সংবিধানে সংযোজিত করা হবে।**

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা, **দৈনিক সংবাদ, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১। হাসানুজ্জামান, **নবপ্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা**, ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ৫৩।

২। এম এ ওয়াজেদ মিয়া, **বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র**, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৪।

৩। ঐ

৪। **দৈনিক জনতা**, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

৫। **দৈনিক ইনকিলাব**, ২৫ এপ্রিল, ১৯৯৪।

৬। **দৈনিক ইত্তেফাক**, ১০ জুন, ১৯৯৪।

৭। **দৈনিক ভোরের কাগজ**, ২৪ নভেম্বর, ১৯৯৫।

৮। **সাপ্তাহিক বিচিত্রা**, ৩০ আগষ্ট, ১৯৯৫।

৯। **Weekly Dhaka Courier**, 24 November, 1995.

১০। **দৈনিক সংবাদ**, ১০মে, ১৯৯৫।

১১। Allen R. Ball, **Modern Politics and Governmet**, London, The Macmillan Press Ltd. 1981, Page- 156.

১২। N. Ahmed, "Committees in the Bangladesh Parliament", **Legislature Studies**, 1998, vol- 13, No. 4, P-19.

১৩। নিয়াজ আহম্মদ খান, মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, আনম মুনির আহম্মেদ, "জবাবদিহিতা, নীতি নির্ধারন ও সংসদীয় কমিটি, বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, উন্নয়ন বিতর্ক," **ত্রৈমাসিক জার্নাল**, অষ্টাদশ বর্ষ জুন ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৭৫।

১৪। আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, "**বাংলাদেশ কমিটি ব্যবস্থা**," মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত "গণতন্ত্র" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা- ১২৬।

১৫। **সাপ্তাহিক যায়যায় দিন**, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।

১৬। **দৈনিক ইত্তেফাক**, ২৫মে, ১৯৯৪।

১৭। **ঢাকা কুরিয়ার**, ১৩ মার্চ, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৮। Nazrul Islam, Parliamentary Democracy in Bangladesh; An Assessment, **Perspective in Social Science**, Vol-5, 1998, October.

১৯। **দৈনিক সংবাদ**, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।

২০। **দৈনিক আজকের কাগজ**, ২৯ জুলাই, ১৯৯৩।

২১। **দৈনিক ইত্তেফাক**, ১৯ জুলাই, ১৯৯৩।

২২। **দৈনিক জনকণ্ঠ**, ৩ এপ্রিল, ১৯৯৫।

২৩। **দৈনিক সংবাদ**, ৪ এপ্রিল, ১৯৯৫।

২৪। **সাপ্তাহিক যায় যায় দিন**, ১৪ জুলাই, ১৯৯৫।

২৫। **দৈনিক আজকের কাগজ**, ঢাকা, ২৩ জুলাই, ১৯৯১।

২৬। Anu Muhammad, "**Economics of The World Bank**; Growing Resources, Increasing Deprivation," Weekly Holiday, December, 1995.

২৭। **দৈনিক বাংলার বানী**, ৭ মে, ১৯৯৬।

২৮। **বি.বি.এস. পরিসংখ্যান পকেট বুক**, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ১২৭।

২৯। আনু মাহমুদ, "শিল্পায়নে বিলম্বিত পদক্ষেপ আত্মঘাতি মূলত হতে পারে," **দৈনিক খবর**, ১৯৯৪।

৩০। বদরুদ্দিন ওমর, **বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র**, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৪।

৩১। আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, **গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সংকট**, প্রশাসক মো: আব্দুল কাদের, কবি জসীম উদ্দিন রোড, পৃষ্ঠা- ২২।

৩২। **দৈনিক সংবাদ**, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।

৩৩। **দৈনিক জনকণ্ঠ**, ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৬।

৩৪। আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন, **গণতন্ত্র, নেতৃত্ব ও উন্নয়ন**, প্রশাসক মো: আব্দুল কাদের, ১৬, কবি জসীম উদ্দিন রোড, পৃষ্ঠা- ৯১।

৩৫। হিরালাল বালা, **বাংলাদেশের দারিদ্র্যঃ অতীত ও বর্তমান**; তারেক সামসুর রহমান, **বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর**, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৮৮।

৩৬। **বি আই ডি এস তথ্যসূত্র**, ১৯৯৪।

৩৭। **Far Eastern Economic Review**, 31 December, 1992.

Dhaka University Institutional Repository

৩৮। **সাপ্তাহিক বিচিত্রা**, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

৩৯। **সাপ্তাহিক বিচিত্রা**, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

৪০। হীরালাল বালা, **বাংলাদেশ দারিদ্র্য, অতীত ও বর্তমান, বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর**, সম্পাদনা তারেক সামছুর রহমান, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ১৯৫।

৪১। ০১-০৩-১৯৯৪ তারিখে সংসদে প্রশ্নোত্তর দানকালে শিক্ষামন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে। **দৈনিক সংবাদ**, ২ মার্চ, ১৯৯৪।

৪২। **দৈনিক ভোরের কাগজ**, ৩ জুলাই, ১৯৯২।

৪৩। **দৈনিক সংবাদ**, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।

৪৪। **দৈনিক আজকের কাগজ**, ২০ মার্চ, ১৯৯৪।

৪৫। এম এ ওয়াজেদ মিয়া, **বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র**, পৃষ্ঠা- ১৪৫, ১৯৯৪।

৪৬। **দৈনিক আজকের কাগজ**, ২১ মার্চ, ১৯৯৪।

৪৭। **দৈনিক সংবাদ** ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

৪৮। এম. এ ওয়াজেদ মিয়া, **প্রগুক্ত**।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষনা, **দৈনিক সংবাদ, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- ৫

সংসদীয় গণতন্ত্র এবং এর কার্যক্রমের মূল্যায়ন (১৯৯১-১৯৯৬)

Parliamentery Democracy and any Evaluation of its working (1991-1996)

গণতন্ত্র নন্দিত এবং নিন্দিত উভয়ই। তবে নিন্দাবাদের তুলনায় এর প্রশংসার দিকটিই বেশী পরিদৃষ্ট হয়। গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের এই দুর্বলতার কারণ অনেক। এসবের মধ্যে তিনটি কারণকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, গণতন্ত্র শাসন কাঠামোতে জনগণের প্রতিনিধিত্বের কথা বলে; দ্বিতীয়ত, শাসিতের কাছে শাসকবর্গকে দায়িত্বশীল (Responsible), সংবেদনশীল (Responsive) ও দায়বদ্ধ (Accountable) রাখতে চায়; এবং তৃতীয়ত, এতে আইনের শাসন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, একটি সরকার কতটুকু গণতান্ত্রিক, তা নিরূপন করার জন্য এসব বিষয়কে চলক (Variable) হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ উপরোক্ত বিষয়সমূহের কোনটি কি পরিমানে কোন অবস্থায় উপস্থিত, তার ভিত্তিতে উদ্দিষ্ট ব্যবস্থাটি কতটুকু গণতান্ত্রিক তার মাত্রা নির্ধারিত হয়। একথা বলাই বাহুল্য যে, কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই একেবারে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর নয়। কোনটি অপেক্ষাকৃত বেশী গণতান্ত্রিক। আবার কোনটি অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া গণতন্ত্রের সত্যিকার রূপ কি তা নিয়েও রয়েছে বিতর্ক।[১]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যসূচক চলকের কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তার কোনোটির আপেক্ষিক গুরুত্বই কোনো অংশে কম নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সক্রিয়, সচল, কার্যক্রম ও ফলপ্রসূ করবার জন্যে সবকটি বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতিই জরুরী। তবে এসবের মধ্যেও ওয়েটেজ বা আনুপাতিক গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যকে অর্থাৎ সরকারের দায়িত্বশীলতাকে সর্বাদিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বস্তুতঃ শাসিতের কাজে শাসকবর্গকে দায়িত্বশীল, তাদের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল এবং জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য রাখার বিষয়টি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, একে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণসত্তা বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যান্য বহিরাঙ্গ তথা কাঠামোগত বিন্যাস যতই সুন্দর ও কাম্যমনের হোকনা কেন, এব্যবস্থা থেকে কাংখিত ফল লাভ করতে হলে শাসন ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতা অপরিহার্য। শাসক

Dhaka University Institutional Repository

বর্গের দায়িত্বশীলতা যে ব্যবস্থায় অনুপস্থিত তাকে আর যাই হোক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলার সুযোগ নেই। সে ধরণের ব্যবস্থা গণতন্ত্রের নামে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। [২]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দু'টো পদ্ধতি চালু রয়েছে। সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি, উভয় পদ্ধতিতেই সরকারকে দায়িত্বশীল রাখবার জন্য কিছু উপায়ের কথা বলা হয়। এসবের মধ্যে কোনটি অধিকতর দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক রয়েছে। তবে জনগণের নির্বাচিত আইনসভার কাছে নির্বাহী বিভাগকে সরাসরি এবং সমষ্টিক ভাবে দায়বদ্ধ রাখার বিধান সংসদীয় ব্যবস্থারই একক ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। সে কারণে সাধারণভাবে দায়িত্বশীল সরকার বলতে সংসদীয় সরকারকেই বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার অর্থই কি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা?[৩]

অষ্টাদশ শতকের প্রথম বৃটেনে পার্লামেন্টারী সরকার প্রবর্তিত হয়। পরে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ভারত, জাপান, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্রে এ ধরণের সরকার প্রবর্তিত হয়।[৪]

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করা কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ বলেও আধুনিক বিশ্বে এটি অতিকতর গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। পশ্চিমা ধাঁচে বা বৃটিশ মডেলের অনুকরণে পৃথিবীর অনেক দেশে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোতে এ ধরণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।[৫]

যে শাসন ব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট এবং শাসন বিভাগের দায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল তাকে সংসদীয় সরকার বলা হয়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সংসদীয় সরকারের উপরোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা সত্ত্বেও বর্তমানে এরূপ শাসন ব্যবস্থায় সংসদের প্রাধান্যের পরিবর্তে মন্ত্রীপরিষদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই অনেকে এরূপ শাসন ব্যবস্থাকে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার বলে অভিহিত করেন। অনেক সময় আবার এরূপ শাসন ব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা বা সংসদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা বলা হয়।[৬]

এ ব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারীভাবে স্বীকৃত। এ ব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন, যেমন- বৃটেনের রাজা বা রানী বা ভারতের প্রেসিডেন্ট। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠণ করে এবং আইনসভার সমর্থনের ওপর সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে। এই পদ্ধতিতে সরকার আস্থা হারালে

Dhaka University Institutional Repository

জোরপূর্বক দেশ শাসন করতে পারে না। সেজন্য অত্যন্ত সতর্কভাবে ক্ষমতাসীন দলকে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। মন্ত্রীসভা সমষ্টিগতভাবে আইনসভার নিকট দায়ী।[৭]

পার্লামেন্টারী বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জে. ডব্লিউ. গার্নার বলেছেন, "ইহা হলো এমন এক ধরণের শাসনব্যবস্থা যেখানে প্রকৃত শাসক বা মন্ত্রীপরিষদ তার রাজনৈতিক কার্যাবলীর জন্য প্রত্যক্ষ ও আইন সঙ্গতভাবে আইনসভা বা ইহার একটি কক্ষের (সাধারণত জনপ্রিয় কক্ষ) নিকট দায়ী থাকে এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচকমন্ডলীর নিকট দায়ী থাকে। এখানে নাম সর্বস্ব শাসক অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি দায়িত্বপূর্ণ নহে।[৮]

বাংলাদেশের সংবিধানে আইন সংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠণের বিধান রয়েছে। সংবিধানের ৭৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদকে সংসদীয় বিধি (Rules of Procedure) অনুসারে পাবলিক একাউন্টস কমিটিসহ অন্যান্য স্টান্ডিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। এভাবে জাতীয় সংসদের অতিরিক্ত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছিলো। যার উদ্দেশ্য ছিলো: খসড়া বিল বিবেচনা করা; সংসদীয় প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করা; আইন প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের পর্যালোচনা ও প্রস্তাব রাখা এবং প্রশাসন ও মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মকান্ডের পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালানো। উপরোক্ত কমিটিসমূহ তাদের ওপর অর্পিত কাজের জন্য সাক্ষী প্রদান করতে এবং প্রয়োজনীয় দলিল বা তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে সংসদ কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত। কিন্তু কমিটির রিপোর্ট এবং সুপারিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কমিটিসমূহের পরামর্শ কদাচিৎ বাস্তবায়িত হয়। এ প্রসঙ্গে পাবলিক একাউন্টস কমিটির উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে পাবলিক একাউন্টস কমিটির তৃতীয় রিপোর্টে[৯] উল্লেখ করা হয় যে, অনেক ক্ষেত্রেই এর সুপারিশগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়না এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেগুলো একেবারেই বাস্তবায়িত হয়নি। অধিকন্তু মন্ত্রণালয়সমূহ অডিট আপত্তি নিরসনসহ অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদনে অনীহা প্রদর্শন করে এবং এভাবে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা বন্ধ করতে কমিটির নির্দেশ বা সুপারিশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। উক্ত রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয় যে, শুধু অতীতের হিসেব এবং প্রতিবেদন পরীক্ষা করা বা সুপারিশ করা অর্থহীন কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। এসব কারণে বলা যেতে পারে যে, যুক্তরাজ্য বা ভারতের প্রতিপক্ষের ন্যায় বাংলাদেশের পাবলিক একাউন্টস কমিটি যথেষ্ট কার্যকর হতে পারেনি এবং এর মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত হয়নি। কমিটির রিপোর্টের

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বহীনতার আর একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে সরকারী সংস্থাগুলোর অব্যবস্থা ও অসঙ্গতি সম্বলিত দু'টি রিপোর্ট পেশ করা সত্ত্বেও দুর্নীতিসহ অন্যান্য অনিয়ম দূর করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি।[১০] কমিটিসমূহের রিপোর্ট এবং সুপারিশ কদাচিৎ বাস্তবায়নে সরকারের স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতার ওপর প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের জরীপে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের দেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে সম্পূর্ণ বলেছেন ৫.৮৪%, মোটেই না ১৭%, অধিকাংশ ১৯.৮৯%, আংশিক ৫০.৮৯% এবং মোটামুটি বলেছেন ৯.২২%। নিম্নোক্ত সারণী দ্রষ্টব্য:

সারণী- ৫.১

উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা						
	সংসদ সদস্য	শিক্ষক	সাংবাদিক	আইনজীবী	ছাত্র	মোট	শতকার
সম্পূর্ণ	২	-	-	-	১	২	৫.৮৪
মোটেই না	-	৪	৬	৩	৪	১৭	১৭
অধিকাংশ	২	২	৫	৫	১	১৫	১৯.৮৯
আংশিক	৪	১১	৮	৯	১৪	৪৬	৫০.৮৯
মোটামুটি	১	৩	১	৩	-	৮	৯.২২

নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে এবং সংসদকে কার্যকর রাখার জন্য সংসদীয় কমিটি গুলোর তড়িৎ দায়িত্ব পালনসহ রিপোর্ট প্রদান বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু পঞ্চম জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কমিটি ঐক্যমতের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর ছিলো। কৃষিমন্ত্রীর দূর্নীতি সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি স্পীকারের নেতৃত্বে গঠিত হয় এবং একডজনেরও অধিকবার বৈঠক করেও এর টার্মস অব রেফারেন্স প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্য আর একটি কমিটিতে জেলা পরিষদের কাঠামো সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর হয়নি।[১১] ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (রিপিল) বিলের ওপর গঠিত বিশেষ কমিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারেনি। সংসদীয় ব্যবস্থায় উপযোগী নতুন বিধিমালা প্রণয়নে গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটি বিভিন্ন বৈঠক করেও ঐকমত্যে পৌছতে ব্যর্থ হয়েছে।[১২] অথচ সাক্ষাৎ প্রার্থীদের শতকরা ১০০% ই ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ আইন বাতিলের পক্ষে ছিলেন। তাঁদের মতে, "সকল হত্যারই বিচার হওয়া উচিৎ"। উল্লেখ্য

Dhaka University Institutional Repository

এসব সংসদীয় কমিটিসমূহের অকার্যকারিতায় নেতিবাচক প্রভাব সার্বিকভাবে কমিটি ব্যবস্থার উপর পড়ে এবং সংসদ কর্তৃক সরকারের জবাবদিহিতা অর্জনের প্রক্রিয়া অনুপস্থিত থেকে যায়।

সরকার বাজার অর্থনীতির কথা বললেও বি. এন. পি'র শাসনামলে বাজার অর্থনীতির ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্যবসা-বানিজ্যে সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটেছে প্রতিনিয়ত। কে কোন ব্যবসা পাবে, কাকে কি কাজ দেয়া হবে তা অনেকাংশে সরকারী দলের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল ছিলো। সর্বনিম্ন দরপত্র দাতাকে কাজ না দিয়ে অনেক সময় পছন্দসই ব্যক্তিদেরকে কাজ দেয়া হয়েছে।[১৩] বি. এন. পি সরকার ক্ষমতায় যাওয়ার আগে কৃষকদের বলেছিলেন, ন্যায্যমূল্যে সার বীজ ও নলকূপ সরবরাহ করবেন। ক্ষমতাসীন বি. এন. পির কাজ থেকে কৃষকরা সার পায়নি। পেয়েছে গুলি টিয়ার গ্যাস ও লাঠি। ১৭ জন কৃষককে গুলি করে মারা হয়েছে সার চাওয়ার অপরাধে।[১৪]

সংসদের মূল দায়িত্ব দেশের আইনসভা হিসেবে কাজ করা। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমে পাস করে তাকে সংসদে বৈধ করে নেয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন পাস হয় সংসদে এবং সেখানে তা আলোচিত হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন বাছাই কমিটিতে যায় ও সেই সম্বন্ধে অনেক সময় জনমত যাচাই করা হয়। আমাদের আইন প্রণয়নের বেলায় তা বলতে গেলে ঘটেইনি। সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে গণতন্ত্রে কোনো আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমেই জারি করা মোটেই উচিত নয়। অথচ এই অপকর্মটি করার ব্যাপারে আমরা দ্বিধা করিনা। যতদিন না আইন পাসের ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে সংসদের কাছে আসবে ততদিন সংসদীয় গণতন্ত্র সফল হবে না।[১৫] পঞ্চম সংসদে প্রায় এক তৃতীয়াংশ অধ্যাদেশ সংক্রান্ত আইন পাস কি গণতান্ত্রিক ? এর ওপর বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তর দাতাদের মধ্যে ৪৫.৪৪% হ্যাঁ ২৮.৮৯% নেতিবাচক এবং ২৩.৬৭% কোনো তথ্য দেয়নি। নিম্নোক্ত সারণী দ্রষ্টব্যঃ

সারণী- ৫.২

উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা						
	সংসদ সদস্য	শিক্ষক	সাংবাদিক	আইনজীবী	ছাত্র	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	২	৯	৯	১২	১৩	৪৫	৪৫.৪৪
না	৪	৮	২	৫	৫	২৪	২৮.৮৯
জানিনা	৩	৩	৯	৩	২	২০	২৩.৬৭

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ হাউজ অব লর্ডস এর সদস্য লর্ড ওয়েদাবিল বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। লর্ড হবার পূর্বে তিনি পাঁচ বছর হাউজ অব কমন্সের স্পীকার ছিলেন। লর্ড হবার পূর্বে তিন পাঁচ বছর হাউজ অব কমন্সের স্পীকার ছিলেন। লর্ড ওয়েদাবিল ছিলেন রক্ষণশীল দলের সদস্য কিন্তু স্পীকার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি এক দিনের জন্যও পার্টির মিটিং এ যোগদান করেননি। কারণ তা সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমাদের পঞ্চম সংসদের স্পীকার এই ঐতিহ্য পালন করেননি। ফলে আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা ক্ষুন্ন হয়েছে।[১৬]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সংসদকে পাশ কাটিয়ে অধ্যাদেশ আকারে আইন জারির প্রবনতা নিয়ে সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে দ্বাদশ অধিবেশন পর্যন্ত বিরোধী দল ছিলো সমালোচনা মূখর। পঞ্চম সংসদে বাইশটি অধিবেশনে পাস হয়েছে ১৭৩ টি বিল। তন্মধ্যে ৫৭ টি অধ্যাদেশ বিল এবং ১ টি বেসরকারী বিল পাস হয়।[১৭] বাইশটি অধিবেশনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সতেরবার কথা বলেছেন। আর তেরটি অধিবেশনের মধ্যে শেখ হাসিনা মোট পঁয়ত্রিশ বার কথা বলেছেন। তেরটি অধিবেশনের মধ্যে একটি অধিবেশনে শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন না।[১৮] পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলের সদস্যরা মোট বাষট্টি বার ওয়াক আউট করেন।[১৯]

বি. এন. পির পাঁচ বছরের শাসনে পররাষ্ট্র নীতিতে সাফল্যের বিন্দুমাত্র চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিন বিঘা করিডোর পাওয়াটাকে ফলাও করে প্রচার করা হলেও, এখন দহগ্রাম আঙ্গরপোতাবাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে তারা কতটুকু স্বাধীন। আসলে তারা বুঝতে পেরেছে তিন বিঘা পায়নি। ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে সরকার বরাবর হৈ চৈ করেছে। বেগম জিয়া জাতিসংঘ ও কমনওয়েলথে ফারাক্কা সমস্যা তুলে ধরেছেন। এ নিয়ে কতবার বৈঠক হয়েছে তা কেবল মাত্র মন্ত্রণালয়ই বলতে পারবে। এসব কিছু কিন্তু গঙ্গার পানির হিস্যা পাবার কোনো বাস্তব উদ্যোগ নয়। সরকারের দায়িত্ব শুধু সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকা নয় মেধা এবং কুটনৈতিক চাতুর্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে যা করেছে তাতে সমস্যা আরো জটিল হয়েছে। বাহ্যিক দিক থেকে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক তেমন একটা ভাল না হলেও বাস্তবে কিন্তু এদেশ ভারতের বাজারে পরিণত হয়েছে। দেশের সম্ভাবনাময় শিল্পগুলো ভারতের বানিজ্য আগ্রাসনের কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে। পাকিস্তানের কাছে পাওনা আদায়, আটকে পড়া পাকিস্তানী -দের ফিরিয়ে নেয়া, এ দু'টি মারাত্মক এবং জটিল সমস্যাও বি. এন. পি সরকার সমাধান করতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

রোহিঙ্গা সমস্যা পররাষ্ট্র নীতির সীমাহীন ব্যর্থতা গোটা জাতিকে পীড়িত করেছে। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার যে অঙ্গীকার বি. এন. পি করেছিলো তা গাল ভরা বুলিতে রূপান্তরিত হয়েছে। একুশে জুন '৯২ এদেশে সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে বি. এন. পি সরকার। ঐ দিন প্রেসক্লাবে ঢুকে যেভাবে পুলিশ সাংবাদিকদের নির্যাতন করেছে তা সভ্য সমাজে এক নজির বিহীন ঘটনা। এই ব্যাপারে তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হলেও কোনো রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। কিংবা দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সাংবাদিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। যা প্রকারান্তে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে। রেডিও টেলিভিশনকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার অঙ্গীকার থাকলেও বি. এন. পি সরকার বেশী করে এটাকে দলীয়করণ করেছে। বিরোধী দল থেকে রেডিও টেলিভিশনের স্বায়ত্বশাসন করার একটি প্রস্তাবিত বিল সরকার নাকচ করে দেয়। তবে প্রশ্ন হচ্ছে বিগত পাঁচ বছর বিশেষ করে চলমান আন্দোলনের দু'বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে যে সব দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নির্লজ্জ দলীয়করণ আর সার খাদ্য, শ্রমিক কর্মচারীদের দাবীসহ সরকারের দলত্যাগ ও অবাধ নির্বাচন বাতিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি দমানোর জন্য নির্বিচারে যে হত্যাকান্ড চালানো হয়েছে, সংবিধানে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার বর্ম হিসেবে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সচিবালয়ের কর্মচারীকে রাস্তায় নামতে বাধ্য করার পরিস্থিতি যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে পরিকল্পিত ভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে, এসবের দায় দায়িত্ব বি. এন. পি সরকার এড়াতে পারেনি।[২০]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা

Conception of the Caretaker Government

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীটি প্রথম বাংলাদেশের রাজনীতিতে উঠে আসে। প্রথম কে তুলেছিল এ রকম দাবী তা নিয়ে তৎকালীন পাঁচদল এবং জামাত ইসলামীর মধ্যে বিতর্ক আছে। সে যাই হোক ঘটনাক্রমে এই ইস্যু এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মূল শ্লোগান হয়ে উঠেছিল '৯০তে। তীব্র আন্দোলনের চাপে যথারীতি এরশাদের পতন হয়। সাংবিধানিক ধাপ অনুসরন করে এরশাদ ক্ষমতা থেকে সরে আসেন। তৎকালীন তিন জোটের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন। তাঁরই নেতৃত্বে যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় সেই অন্তবর্তীকালীন সরকারের অধীনেই '৯১ এর ফেব্রুয়ারীতে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বি. এন. পি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন এবং জামাতের প্রয়োজনীয় সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। কালক্রমে বি. এন. পি সরকারের আমলেই আবারও সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুটি ধীরে ধীরে সামনে চলে আসে।[২১] অবশ্য পঞ্চম সংসদের শুরুর দিকেই '৯২ সালে জামাতে ইসলামী সংসদে তত্ত্বাধায়ক সরকারের একটি সংশোধনী বিল পেশ করে রাখে। কারণ তাদের জানা ছিলো এই ইস্যু আবারও আসবে। ১৯৯৪ সালে এসে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যু আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে আওয়ামীলীগের আবদুর রহিম এবং জাতীয় পার্টির মওদুদ আহমেদও অনুরূপ একটি করে বিল সংসদে জমা দেন।[২২]

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ও সকট শুরু

১৯৯৪ সালের ৩০ জানুয়ারী দেশে চারটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বি. এন. পি ঢাকা ও চট্টগ্রামে হেরে যায়। এ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের প্রতি মানুষের আস্থা ছিলো। কিন্তু সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ঢাকা ও চট্টগ্রামে হেরে যাওয়ায় বি. এন. পি শংকিত হয়ে ওঠে। তারা সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে। পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে যে কোনো প্রকারে জয়লাভের চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। এ চিন্তা ভাবনার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটে মাগুরা উপ-নির্বাচনে। এ মাগুরা উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই দেশে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হতে থাকে।[২৩]

তৎপূর্বে ইসরাইল অধিকৃত হেবরন মসজিদে নামাজ পড়া অবস্থায় গুলি করে ৬৩ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করার ঘটনাটি নিয়ে বিরোধী দল ১ মার্চ '৯৪ এর সংসদ অধিবেশনে আলোচনার দাবী তোলার পর বিরোধী দল ও সরকারী দল বিতর্কে অবতীর্ন হয়, এক পর্যায়ে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা বিরোধী দলকে "হঠাৎ মুসলমান" বলে কটাক্ষ করলে সংসদে অচলাবস্থা দেখা দেয়। তুমুল প্রতিবাদের মুখে তথ্যমন্ত্রী তাঁর মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং তা প্রত্যাহার করলেও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার দাবী অনুযায়ী তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করায় বিরোধী দল সংসদ থেকে একযোগে ওয়াক আউট করে। এর পর বিরোধী দল আর সংসদে ফিরে যায়নি।[২৪]

এই সংসদ বর্জন চলাকালীন অবস্থাতেই মাগুরা-২ আসনে ২০ মার্চ তারিখে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সরকার নজিরবিহীন কারচুপির আশ্রয় নিয়েছে, যাতে বিরোধী দল একযোগে ভোট ডাকাতি, সন্ত্রাস ও কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে। জাতীয় সংবাদ পত্রেও মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্টেও নজিরবিহীন ভোট ডাকাতির খবর আসে, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নির্বাচন '৮৮'র এরশাদের ভোট ডাকাতিকেও

Dhaka University Institutional Repository

হার মানিয়েছে বলে খবর প্রচার করেছে। কারণ ৮৮'র ভোট ডাকাতিতে সর্বোচ্চ ৬৫% ভোট পড়েছে অথচ মাগুরা নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে ৭২%। সব কয়টি বিরোধী দল এ নির্বাচনের ফলাফলকে প্রত্যাখান করে। এ নির্বাচনের পরিণতিই বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবীকে আন্দোলনে রূপদান করে। তাঁরা দাবী করে যে, বি. এন. পির অধীনে ভবিষ্যতে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংবিধান সংশোধনের বিল বি. এন. পি'কেই সংসদে উত্থাপন করতে হবে। বিল না আসা পর্যন্ত সংসদে ফিরে যাবে না বলে বিরোধী দলগুলো অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।[২৫] পঞ্চম সংসদের উপ-নির্বাচনগুলো অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছিল কিনা। এর ওপর জরিপ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের মধ্যে হ্যাঁ বলেছেন ২২.১১%, না ৩৯.২২%, অধিকাংশ ১৬.২২%, আংশিক ৬% এবং মোটামুটি বলেছেন ১৬.৪৪%। নিম্নের সারণীতে তা ছকের সাহায্যে দেখানো হলো:

সারণী- ৫.৩

উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা						
	সংসদ সদস্য	শিক্ষক	সাংবাদিক	আইনজীবী	ছাত্র	মোট	শতকার
হ্যাঁ	৫	২	৩	৩	৩	১৬	২২.১১
না	১	৯	৭	১০	১১	৩৮	৩৯.২২
অধিকাংশ	১	৬	১	৩	৪	১৫	১৬.২২
আংশিক	-	-	৩	২	১	৬	৬
মোটামুটি	২	৩	৬	২	১	১৪	১৬.৪৪

৬ জুন বিরোধী দলবিহীন বাজেট অধিবেশন বসে। ২৭ জুন সংসদ ভবনে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাত ইসলামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া উক্ত রূপরেখাকে অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা বাড়তে থাকে।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধীদের পদত্যাগ

৬ ডিসেম্বর আওয়ামীলীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামাত-ই-ইসলামী পৃথক পৃথক সমাবেশ থেকে সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে '২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়ে ২৮ ডিসেম্বর একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেয়। কিন্তু সরকার তার অবস্থানে অনড় থাকায় ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলীয় ১৪৭ জন এমপি পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। বিরোধী দলগুলোর পদত্যাগই কি ছিল একমাত্র পথ? এর ওপর জরিপে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৮.৬৭% ইতিবাচক মতামত প্রদান করেছেন এবং ৮১.৩৪% নেতিবাচক তথ্য দেন। নিম্নোক্ত ছকের সাহায্যে তা দেখানো হলেঃ

সারণী ৫.৪

উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা						
	সংসদ সদস্য	শিক্ষক	সাংবাদিক	আইনজীবী	ছাত্র	মোট	শতকার
হ্যাঁ	৩	১	২	৭	২	১৫	১৮.৬৭
না	৬	১৯	১৮	১৩	১৮	৭৪	৮১.৩৪

২৩ ফেব্রুয়ারী স্পীকার পদত্যাগ পত্র গ্রহণযোগ্য নয় বলে রুলিং দেন। ফলে বিরোধী শিবিরে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এর পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ২৯ ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জ এক জনসভায় বক্তৃতায় বলেন, তিনি নির্বাচনের ৩০ দিন আগে পদত্যাগ করবেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে ভিন্ন প্রস্তাব

এদিকে ৯৫'র ১০ জানুয়ারী 'বঙ্গবন্ধু প্রত্যাবর্তন' দিবসের একটি বক্তৃতায় শেখ হাসিনা বলেন, রাষ্ট্রপতির অধীনে নির্দলীয় উপদেষ্টামন্ডলী নিয়োগ করে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার হতে পারে। সরকার বিরোধী দলীয় নেত্রীর সেই প্রস্তাবের কোন জবাব দেয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার মূল দাবী থেকে শেখ হাসিনা খানিকটা সরে আসার প্রস্তাব দিলেও সরকার গ্রহণ করেনি। সরকার যে অবস্থানটি বার বার ঘোষণা করেছে সেটি হলো বর্তমান সংবিধানের ভিতরই কিছু করতে হবে। কিভাবে বর্তমান সরকার পদত্যাগের পর ৩০ দিন একটি সরকার চলবে তা আলোচনা হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ইতোমধ্যে ১৯৯৫ সালের ১৯ জুন পর্যন্ত বিরোধী এমপিদের সংসদে ৯০ টি কার্যদিবস একাধিক্রমে অনুপস্থিতি পূর্ণ হয়। ২৭ জুলাই তারিখে পদত্যাগী সাংসদদের আসন শূন্য হওয়ার পক্ষে সুপ্রীমকোর্ট মতামত দেয়। ৩১ জুলাই ৮৭ জন বিরোধী সাংসদদের আসন সংসদ সচিবালয় থেকে শূন্য ঘোষণা করা হয় এবং ৫৫ জন বয়কট কালে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেছিলেন বলে তাঁদেরকে সংসদ সচিবালয় থেকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয় যে, যেদিন তারা হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেছিলেন, সেদিন তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কিনা? কিন্তু সাংসদগণ চিঠির কোন উত্তর দেননি। অবশেষে ৭ আগষ্ট উক্ত ৫৫ জনের আসনও শূন্য ঘোষণা করা হয়।[২৭] বিরোধী দলের আসন শূন্য হওয়ার পর সরকারী দলের সংসদ ভেঙ্গে দেয়া সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর সাক্ষাৎ প্রার্থীদের মধ্যে ৪২.৬৭% ইতিবাচক তথ্য এবং ৫৬.৩৩% নেতিবাচক তথ্য প্রদান করেন। নিম্নোক্ত ছকের সাহায্যে তা দেখানো হলো ঃ

সারণী ৫.৫

উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা						
	সংসদ সদস্য	শিক্ষক	সাংবাদিক	আইনজীবী	ছাত্র	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	৩	৬	৫	১৫	১০	৩৯	৪২.৬৭
না	৬	১৪	১৫	৫	১০	৫০	৫৬.৩৩

নির্বাচন কমিশন ১৪২ টি শূন্য আসনে ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে উপ-নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। পরে বন্যাজনিত কারণে উপ-নির্বাচন পিছিয়ে ১৫ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়। কিন্তু বিরোধী দলগুলি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। তারা সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে ২ সেপ্টেম্বর থেকে ৩২ ঘন্টা হরতাল পালন করে।[২৮] ৬ সেপ্টেম্বর '৯৫তে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলনে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠণের দাবী জানান এবং অবিলম্বে নতুন নির্বাচন দিতে বলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী উক্ত প্রস্তাবকে আবারো অসাংবিধানিক, অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দিলেন। এই ভিত্তিতে হরতালসহ বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচী চলতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ পরিস্থিতি ও ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মেরিল রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সঙ্গে বৈঠকে নতুন করে সমঝোতার তাগিদ দেন। সরকার ও বিরোধী দলে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ও ব্যর্থসংলাপ সব সময়ই চলেছে। পাশাপাশি পাঁচ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী নাগরিক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন।[২৯] তাদের বিবেচনা ছিলো বর্তমান সংবিধানের ভিতরই বিরোধী দলের নির্দলীয় নিরপেক্ষ দাবীটিকে প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা বের করা, কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর ৯৬ ঘন্টা হরতাল হলো, ১৬ ডিসেম্বর থেকে একাধারে ৭ দিন হরতাল পালিত হলো। হরতাল আর অবরোধের ফলে দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হলো। সরকার উপ-নির্বাচনে না গিয়ে ২৪ নভেম্বর জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়। ১৮ জানুয়ারী সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। পরে তৃতীয় বারের মতো এ তারিখ পরিবর্তন করে নতুন তারিখ দেয়া হয় ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী।

বিরোধী দলগুলোর কোনো দাবির প্রতি সরকার কর্ণপাত না করায় সকল বিরোধী দল নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। একদিনের মধ্যে হঠাৎ তৈরী করা কতিপয় অখ্যাত দল নিয়ে বি. এন. পি এরশাদীয় কায়দায় নির্বাচন করার উদ্যোগ নেয়। বিরোধী দলগুলোর প্রতিরোধের মুখে ১৫ ফেব্রুয়ারী ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশীব্যাপী সহিংসতায় কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হয়। বিদেশী সাংবাদিকদের মতে এ নির্বাচনে ৫%-৬% এর বেশী ভোটার উপস্থিত হতে দেখা যায়নি। ষষ্ঠ পার্লামেন্ট নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের একটি জরিপে ২২.১১% ইতিবাচক, ৩৯.২২% নেতিবাচক, ১৬.২২% অধিকাংশ, ৬% আংশিক ১৬.৪৪% মোটামুটির তথ্য প্রদান করেন। নিম্নোক্ত সারণী দ্রষ্টব্যঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৫.৬

উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা						
	সংসদ সদস্য	শিক্ষক	সাংবাদিক	আইনজীবী	ছাত্র	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	৫	২	৮	৭	২	২৪	৩০.১১
না	১	৯	৯	৭	১০	৩৬	৩৭.২২
অধিকাংশ	১	৬	-	৪	-	১১	১২.২২
আংশিক	১	২	২	১	৫	১১	১২.২২
মোটামুটি	১	১	১	১	৩	৭	৮.২২

নির্বাচনের ফলাফল বিরোধী দলগুলোকে আরও প্রতিবাদমুখর করে তোলে। সারা দেশ রাজনৈতিক বিশৃংখলায় নিপতিত হয়। ২৪, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী অসহযোগ পালিত হয়। ষষ্ঠ সংসদকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এরপরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় ষষ্ঠ সংসদ বাতিলের আন্দোলন। ৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সরকার পক্ষ থেকে লিখিত প্রস্তাব পাঠানো হয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে খোলামনে আলাপ করার জন্য। কিন্তু নির্বাচন বাতিল ও সরকারের পদত্যাগের কোন কথা না থাকায় উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখান হয়। এর পরে ৯ মার্চ হতে সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলগুলোর লাগাতর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই অসহোযোগের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে রাষ্ট্রপতি সংলাপ আহ্বানের জন্য বিরোধী দলগুলোর সাথে মতবিনিময় করেন; দুই শেত্রীর পত্র বিনিময় হয়, পাঁচ বুদ্ধিজীবী বিভিন্নভাবে সমঝোতা আনয়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই প্রধানমন্ত্রীর অনমনীয় পদক্ষেপের কারণে ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়।[৩০]

এই অসহযোগের মাসেই ১৯ মার্চ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় এবং ষষ্ঠ সংসদের অধিবেশন বসে। কিন্তু অসহযোগের ফলে দেশ এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় জনতার মঞ্চ এবং সরকারের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। এতে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি বিরাট অংশও যোগ দেয়। ২৮ মার্চ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ১৪৪ ধারা জারী করেও সরকারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত জনগণের দাবীর মুখেই

Dhaka University Institutional Repository

বিগত সরকার পদত্যাগ করতে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। এভাবে লাগাতার তিন সপ্তাহের অসহযোগ এবং দুই বছরের রাজনৈতিক সংকটের অবসান হলো। প্রশ্ন হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কি গণতান্ত্রিক? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাথমিক সাক্ষাৎকার প্রার্থীদের বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০.১১% বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন গণতান্ত্রিক ছিলো এবং ১৯.৮৯% নেতিবাচক তথ্য দিয়েছেন। নিম্নোক্ত সারণী দ্রষ্টব্যঃ

সারণী- ৫.৭

উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা						
	সংসদ সদস্য	শিক্ষক	সাংবাদিক	আইনজীবী	ছাত্র	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	৫	১৪	১৮	১৯	১৮	৭৪	৮০.১১
না	৪	৬	২	১	২	১৫	১৯.৮৯

পঞ্চম পার্লামেন্ট ও বিরোধী দল

পৃথিবীর সবগুলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে এবং ঐ ধরণের রাষ্ট্রে বিরোধী দল সরকারী যন্ত্রেরই একটি অংশ বিশেষ হিসেবে পরিচিত ও স্বীকৃত। বৃটেন বা কানাডায় বিরোধী দলের নেতা নেত্রী বা উপনেতা সরকারীভাবে স্বীকৃত এবং বেতন-ভাতা ও সরকার প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধা ভোগকারী কর্মকর্তা। ডুভারজার (Duverger) উল্লেখ করেছেন যে, "গ্রেট বৃটেনে সংখ্যা লঘিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্র কর্তৃক বেতন প্রদানের পাশাপাশি মহামান্য রাণীর বিরোধী দলীয় নেতাকে সরকারী উপাধি প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দলকে সরকারের অংশ হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে।[৩১] সুতরাং প্রমান করার অপেক্ষা রাখে না যে বিরোধী দল সংসদীয় ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

স্যার আইভর জেনিংস (Sir Ivor Jennings) বিরোধী দলের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "তাৎক্ষনিকভাবে বিরোধী দল সরকারের বিকল্প এবং গণঅসন্তোষের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে কাজ করে থাকে। এর কার্যক্রম অনেকাংশে সরকারের ন্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ।"

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র থাকে না। মহামান্য রাণীর কাছে বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা সরকারী দলের মতই।[৩২] বস্তুতঃ পক্ষে বিরোধী দল এবং সরকার ঐক্যমতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমালোচনা করার অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। পারস্পারিক সহনশীলতা না থাকলে সংসদীয় সরকার প্রক্রিয়া ভেঙ্গে যায়।[৩৩] বিরোধী দলের সমালোচনার তীব্রতা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে সংযত ও সতর্কভাবে চলতে বাধ্য করে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বৈরাচারী মনোভাবকে প্রতিহত করে।

সংসদীয় ব্যবস্থায় বিতর্ক ও আলোচনার অধিকার স্বীকৃত বলে বিরোধী দল প্রায়ই সুযোগ খুঁজবে সরকারের ব্যর্থতা, দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি কে তুলে ধরার জন্য। তারা সরকারী দলের পাবলিক পলিসি ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভুল ত্রুটি তুলে ধরবে এবং যুক্তির মাধ্যমে জনগণকে এমন ধারণা দেবে যে, ক্ষমতায় গেলে তারা ক্ষমতাসীন দলের চেয়ে অধিকতর সুষ্ঠভাবে দেশকে পরিচালিত করতে পারবে।[৩৪]

এছাড়া সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলই যে শুধু বিরোধিতার ভূমিকা নেবে তা নয়। সরকারী দলের অসন্তুষ্ট অংশ ও বিশেষ ক্ষেত্রে দলের অভ্যন্তরে গঠণমূলক ও কার্যকর সমালোচনা ও বিরোধিতা করবে। বিরোধী দলকে সুপরিকল্পিত নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও রাজনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। কেননা, বিরোধী দলের ভূমিকা শক্তিশালী হয়, কার্যকর হয়, যদি তাদের কর্মসূচীতে সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত বক্তব্য থাকে।[৩৫]

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে পরিবর্তন করার প্রধান পন্থাগুলো হচ্ছে (১) শাসনতান্ত্রিক উপায়ে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে, (২) জনগণের আস্থা অর্জণের মাধ্যমে (৩) নির্বাচন বা ব্যালটের মাধ্যমে। বিরোধী দলগুলোকে মনে রাখতে হবে যে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করাই বিরোধী দলের কাজ নয়। কখনও সরকারের সাথে সহযোগীতা করাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[৩৬] পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলগুলো কেবলমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করে, এর ওপর প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের জরিপে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের দেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে যে তথ্য বের হয়ে আসছে তা হচ্ছে, ২৭.৬৭% বলেছেন সম্পূর্ণ, ২৩.৪৪% অধিকাংশ, ২৫.৬৭% আংশিক, ১২.২২% মোটামুটি, ১১% মোটেই না এবং জানিনার পক্ষে কোন মতামত পাওয়া যায়নি। নিম্নোক্ত সারণী দ্রষ্টব্যঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৫.৮

উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা						
	সংসদ সদস্য	শিক্ষক	সাংবাদিক	আইনজীবী	ছাত্র	মোট	শতকরা
সম্পূর্ণ	৩	৩	৭	৪	৭	২৪	২৭.৬৭
অধিকাংশ	২	৫	৭	৩	৪	২১	২৩.৪৪
আংশিক	৩	৭	৩	৩	৬	২২	২৫.৬৭
মোটামুটি	১	৪	২	৪	-	১১	১২.২২
মোটেই না	-	১	১	৬	৩	১১	১১
জানি না	-	-	-	-	-	-	-

সংসদীয় সরকারে সাধারণতঃ রাষ্ট্রপ্রধান জাতীয় সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। এক্ষেত্রে ভোটাভুটির নজির খুবই বিরল। ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডায় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সেখানে কোন বিরোধী দল কর্তৃক উক্তপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। গত ৮ অক্টোবর ১৯৯১ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় দেখা গেছে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের ভূমিকা ছিলো বি. এন. পি'কে বিনা চ্যালেঞ্জে কোনো কিছু করতে দেয়া হবে না।[৩৭] এভাবে শুরুতেই বিরোধী দলের একটি অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যা গণতান্ত্রিক রীতি নীতির বিরোধী।

"রাজপথ" কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়। আর সংসদীয় গণতন্ত্রকে "রাজপথে" নিয়ে গেলে সেটা ব্যর্থ হয়ে যাবে, "রাজপথ" আমরা কাউকে ইজারা দেইনি বা "বি. এন. পি'কে আমরা গণতন্ত্র শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো" এ ধরণের বক্তব্য উস্কানীমূলক, গঠণমূলক নয়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পারিক শত্রুতা, অবিশ্বাস, অসহযোগিতা এবং অসহনশীলতা তাঁদেরকে একযোগে কাজ করার পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

সংসদে বিরোধী দলের পেশকৃত বিল পাশ না হলে রাজপথে নামতে হবে সরকার পতন ঘটাবার জন্য, এই ধরণের রীতি সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বীকৃত নয়। বৃটেন, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডার দিকে তাকালেই সেটা

Dhaka University Institutional Repository

স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তদুপরি, দুরভিসন্ধিমূলক তৎপরতা, কুৎসা রটানো, সংসদে বিতর্ক চলাকালীন সময়ে ফাইল ছুঁড়ে দেয়া, জুতো প্রদর্শন করা, উস্কানীমূলক কটুক্তি করা ইত্যাদি পার্লামেন্টারী প্রাকটিসের পরিপন্থী।[৩৮] আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা বলেছেন, শেখ হাসিনা চাইলে এই সরকারের পক্ষে ১৫ দিনও ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়।[৩৯] সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেটা কি করে সম্ভব তা আমাদের জানা নেই। কারণ, সংসদীয় গণতন্ত্রে জোর করে যেমন দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় থাকা যায় না, তেমনি জোর করে বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের কোন সুযোগ নেই। পাশাপাশি অন্য একজন আওয়ামী লীগ নেতার বক্তব্য হচ্ছে, আমি কখনও মনে করিনা যে, বি. এন. পি'র সব কিছুই ভুল। আবার একথাও সত্য নয় যে, সকল বিরোধী দল সবসময়ই নির্ভুল। এমন বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক।

পঞ্চম পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দলের দায়িত্ব ও কর্তব্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে ইহা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধান বিরোধী দলকে বিকল্প সরকার মনে করা হয়। কিন্তু মানুষের কাছে বিকল্প সরকারের ছবি তৈরী করার জন্য একটি ছায়া সরকার গঠন করা প্রয়োজন। পঞ্চম সংসদে আমাদের প্রধান বিরোধী দল ছায়া সরকার গড়ে তোলবার কোনো প্রচেষ্টাই করেনি। ফলে সংগঠিতভাবে বিরোধী দল সরকারের মোকাবেলা করতে পারেনি। এই দায় দেশে প্রধান বিরোধী দলকে স্বীকার করতে হবে। ছায়া সরকার বাস্তব সরকারের একটা কল্প স্বরূপ। অর্থাৎ সরকারের বদল হলে ছায়া সরকার সেখানে অধিষ্ঠিত হবে। এ সরকারের মাধ্যমে বিরোধী দলের নীতি সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। তবে ছায়া সরকার গঠন করা মানে এই নয় যে বিরোধী দল নির্বাচনে জিতলে মন্ত্রী হবেন। ছায়া মন্ত্রীসভার লক্ষ্য হলো সংগঠিতভাবে সরকারের বিরোধিতা করা ও বিরোধী দলের নীতি ও সম্ভাব্য দক্ষতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরা।

সংসদীয় সরকার হচ্ছে দলীয় সরকার। দলের মধ্যেই যদি গণতান্ত্রিক চর্চা না থাকে তবে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। বাংলাদেশে রাজনৈতকি দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা খুবই কম। বি. এন. পি'র গণতন্ত্রে দলের চেয়ারম্যানের হাতে সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তিনি দলের ব্যাপারে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ও নেন। জাতীয় পার্টিতেও একই অবস্থা। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে গণতন্ত্রের বিধাণ আছে। কিন্তু বাস্তবে ভিন্ন অবস্থা। "দলের নেত্রী যা বলেন তাই হয়ে থাকে ভিন্ন মত তেমন কোনো মূল্য পায় না।"[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পার্লামেন্টের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বি. এন. পি সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে জনগণকে দেয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংসদীয় পদ্ধতিতে তাদের কার্যধারা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী দুর্নীতিমুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠা, সকল কালাকানুন বাতিল, আইনের শাসন ও বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জনগণ পায়নি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নাগরিকগণ পায়নি ব্যক্তি স্বাধীনতা, রেডিও টেলিভিশনের স্বায়ত্বশাসন, প্রশাসন আইন ও সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি। কৃষকরা ন্যায্যমূল্যে সার ও বীজ পায়নি, সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বাজার অর্থনীতির ধারা, প্রতিশ্রুতি দিয়েও তাঁত ঋণ, চিন্তহীনদের ঋণ ও সমবায়ী ঋণ মওকুফ করেনি।

গণতান্ত্রিক ধারার প্রথম পদক্ষেপ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নিরপেক্ষতার অভাব। অপরদিকে বিরোধী দলগুলোও বিরোধিতার জন্যই সংসদীয় রীতি-নীতির বাইরে বিভিন্ন উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে, ক্রমাগত সংসদ বর্জন, ঘনঘন হরতাল ডেকে ব্যাপক সহিংসতা ও ভাংচুর, রেলপথ, রাজপথ অবরোধ করে একদিকে যেমন দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির ধ্বংস সাধন করে অপরদিকে জনগণের জীবনকে করে তুলেছিলো বিপর্যস্ত। যার প্রেক্ষাপটেই বহু প্রতীক্ষিত পঞ্চম পার্লামেন্টের কার্যবাহে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারা ব্যর্থ হয়। পঞ্চম পার্লামেন্টের কার্যপ্রণালী সংসদীয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন সম্পর্কে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের জরিপে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের নেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা হচ্ছে হ্যাঁ বলেছেন ৩৫.১১%, না ১৮%, অধিকাংশ ১৯.৬৭%, আংশিক ১৮.২২% এবং মোটামুটি ৯% বলেছেন। নিম্নোক্ত সারণী দ্রষ্টব্য ঃ

সারণী- ৫.৯

উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা						
	সংসদ সদস্য	শিক্ষক	সাংবাদিক	আইনজীবী	ছাত্র	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	৫	৬	১০	৩	৫	২৯	৩৫.১১
না	-	৪	২	৭	৫	১৮	১৮
অধিকাংশ	৩	৪	১	৩	৫	১৬	১৯.৬৭
আংশিক	১	৪	৩	৬	৩	১৭	১৮.২২
মোটামুটি	-	২	৪	১	২	৯	৯

Dhaka University Institutional Repository

বহু প্রতীক্ষিত পঞ্চম পার্লামেন্ট যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা করেছিলো সে উদ্দেশ্য পূরণ করতে সম্পূর্ণ সফল না হলেও গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে আংশিক সফলতা লাভ করেছে। প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তাতেও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অনুরূপ ছিলো। তবে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রথম প্রয়োজন ছিলো সরকারের দায়িত্বশীলতা বা দায়বদ্ধতা। কেননা ইহা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণতুল্য। সংসদীয় সরকার তত্ত্বগতভাবে দায়িত্বশীল সরকার হিসেবে পরিগণিত হলেও বাস্তবে এব্যবস্থায় দায়িত্বশীলতার সমস্যা দেখা যায়। তবে বাংলাদেশে যেহেতু রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার বার বার নানাবিধ কারণে একনায়কতন্ত্রে অথবা স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে, তাই সংসদীয় পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মানুষের দুর্বলতা সংসদীয় পদ্ধতির প্রতিই বার বার প্রদর্শিত হয়েছে। ভবিষ্যতে জাতীয় ঐক্যমত্যের ফসল হিসেবে সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে কাংখিত ফল লাভ করতে হলে এ ব্যবস্থায় সরকারের জবাবদিহিতা বা দায়িত্বশীলতা সুনিশ্চিত করতে হবে। এ দায়িত্ব অবশ্য সরকার ও বিরোধী দল উভয়েরই। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থতার প্রধান কারণ হিসাবে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের ১০০%-ই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহযোগিতার অভাবকে দায়ী করেছেন। গবেষকও উত্তরদাতাদের সাথে একমত। সংসদীয় রীতিনীতি ও তার ঐতিহ্যের প্রতি রাজনৈতিক নেতৃত্বের আস্থা ও অঙ্গীকার থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার বিকাশ এবং বিরোধী দলের সদাসতর্ক ও দায়িত্ববান "বিরোধী ভূমিকা"। সংসদীয় কমিটিসমূহকে কার্যকর করতে পারলে সরকারের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারী অনেকটা নিশ্চিত হতে পারে। প্রচার মাধ্যমসমূহও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সবশেষে বলা যায় যে, জনগণের সচেতনতা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির লালন, পোষণ ও পরিপুষ্ট সাধনের মাধ্যমেই দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. মাহবুবুর রহমান, "সংসদীয় গণতন্ত্র ও সরকারের দায়িত্বশীলতা," অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), **বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা**, ঢাকা-করিম বুক কর্পোরেশন, মে ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ৬৭

২. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৭-৬৮

৩. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৮

৪. অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রূপ-রেখা**, কলকাতা; পাইওনিয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কাস, অক্টোবর ১৯৮০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫০।

৫. অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), **বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা**, ঢাকা ঃ করিম বুক কর্পোরেশন, মে ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭।

৬. অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী, অধ্যাপক নিমাই প্রামানিক, **রাষ্ট্রবিজ্ঞান** কলকাতা ঃ শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, জুলাই ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫৮-৪৬০।

৭. ড. আবুল ফজল, ড. মোহম্মদ শামসুর রহমান ও মোহাম্মদ মকসুদুর রহমান **রাষ্ট্রবিজ্ঞান তত্ত্ব ও নীতিমালা**, রাজশাহী বুকস প্যাভিলিয়ন, জুন ১৯৯০, পৃষ্ঠা ঃ ১১৬।

৮. অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, **প্রাগুক্ত**, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫০।

৯. **দৈনিক সংবাদ**, মে ১৯৯১।

১০. **সাপ্তাহিক যায় যায় দিন**, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।

১১. ঐ।

১২. **দৈনিক ইত্তেফাক**, ২৫ মে, ১৯৯৪।

১৩. **সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন**, চিত্রবাংলা, ৫-১১ এপ্রিল, ১৯৯৬।

১৪. ঐ, ১২-১৮ এপ্রিল, ১৯৯৬।

১৫. সৈয়দ আলী আকবর, **সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ**, ঢাকা রিলায়্যাবল কম্পিউটারস, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ঃ ১৮।

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, **বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ**, ১৯৯১-১৯৯৫ (২২ খন্ড)

১৮. **সাপ্তাহিক রোববার**, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

১৯. **বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ**, বুলেটিন, ১৯৯১-১৯৯৫, ২২ খন্ড।

২০. **সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন**, চিত্রবাংলা, ৫-১১ এপ্রিল, ১৯৯৬।

২১. **দৈনিক জনকণ্ঠ**, ২০ অক্টোবর, ১৯৯৫।

২২. ঐ।

২৩. মোঃ আব্দুল হালিম, সংবিধান, **সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ**, ঢাকা ঃ রিকো প্রিন্টার্স, জুন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬১-৩৬২।

২৪. **বাংলা বাজার পত্রিকা**, ২ মার্চ, ১৯৯৪।

২৫. আব্দুল হালিম, **প্রাগুক্ত**, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬২।

২৬. ঐ।

২৭. আব্দুল হালিম, **প্রাগুক্ত**, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৩।

২৮. ঐ।

২৯. পাঁচ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন, সাবেক কুটনীতিক ফখরুদ্দিন আহম্মেদ, আইনজীবী ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ, অর্থনীতিবিদ প্রফেসর রেহমান সোবহান এবং সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ।

৩০. আব্দুল হালিম, **প্রাগুক্ত**, পৃষ্ঠ ঃ ৩৬৪।

৩১. Maurice Duverger, **Political Parties**, London, Msthven Co. Ltd. 1955, P. 414.

৩২. Sir Ivor Jennings, **Cabinet Government**, Cambridge University Press, 1961, P. 16.

৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫০০।

৩৪. Alex N. Dragnich, **Major European Government**, Third Edition, Illinois: Dorsey Press, 1974, P. 78.

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. Maurice Duverger, **Op. cit.**, P. 415.

৩৬. শামসুর রহমান, "রাজনৈতিক দল যেন সন্ত্রাসীদের অভয়াশ্রম না হয়," বাংলার বাণী, ঢাকা, নভেম্বর ৩, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ৪।

৩৭. কামাল উদ্দিন আহমেদ, "সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা", অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), **বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা**, করিম বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, মে, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ৯২।

৩৮. কামাল উদ্দিন আহমেদ, "সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা," অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), **প্রাগুক্ত**, পৃষ্ঠা ঃ ৯৫।

৩৯. **দৈনিক আজকের কাগজ**, ১৯ নভেম্বর, ১৯৯১।

৪০. **খবরের কাগজ**, ১১ জুলাই, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Conclusion

প্রতিষ্ঠানগত ও কার্যকাঠামোগত দিক থেকে পঞ্চম সংসদ ব্যর্থ হয়। কেননা বিচার ব্যবস্থা, প্রতিযোগিতামূলক দলীয় ব্যবস্থা, নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্র প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা যা গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত তা এখানে পরিলক্ষিত হয়নি। এই সরকারের আমলে দুটি উপনির্বাচনে পরিলক্ষিত হয়েছে দুর্নীতি, কালো টাকার ছড়াছড়ি, অস্ত্রবলে ভোটকেন্দ্র দখল ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই এর ঘটনা আর এই ঘটনাই জন্ম দিয়েছে বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন। নির্বাচিত সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না মনে করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এই দাবির প্রতি সরকারী দল প্রথমে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে বিরোধী দলের এই দাবী সঠিক হলেও, দাবী আদায়ের প্রক্রিয়া সঠিক ছিল না। সংসদ থেকে তারা নয়, রাজপথ থেকে তারা এই দাবী তোলে। তথ্য মন্ত্রীর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সংসদ বর্জন করলেও এই দাবী আদায়ের জন্য আর সংসদে ফিরে আসেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সরকারী দলের ভূমিকা ছিল অস্পষ্ট। তারা এই দাবীকে সাংবিধানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ঠিকই কিন্তু একটি অগ্রহণযোগ্য ষষ্ঠ সংসদের মাধ্যমে। বিরোধী দলগুলো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচনের দাবীতে দীর্ঘ দিন সংসদ বর্জন করে এবং এক পর্যায়ে বিরোধী সাংসদগণ পদত্যাগ করেন। ফলে সংসদ এক দলীয় সংস্থায় পরিণত হয়। সংসদ থেকেও বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারতো। তেমনি ক্ষমতাসীন বি.এন.পি'র পক্ষে বিরোধী দল সমূহের দাবী উপেক্ষা করে প্রায় দু'বছর (১৯৯৪-১৯৯৬) এক দলীয় সংসদ চালানো গণতন্ত্র সম্মত ছিল না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে দাবী ১৯৯৬ সালে মেনে নেয়া হলো তা ১৯৯৪ সালে মেনে নেয়া হলে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ আরও সমৃদ্ধ হত।"

পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে পঞ্চম সংসদই ছিল একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী। মেয়াদ, অধিবেশন, কার্যদিবস, এসব দিক দিয়ে পূর্বের সকল সংসদের তুলনায় পঞ্চম সংসদকে একটি সফল সংসদ বলা যায়। এই সংসদে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত রচনা করা হয়। বিন.এন.পি বিগত পাঁচ বছরে ২২টি অধিবেশনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যায়ে জাতীয় সংসদকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা এ কাজে বিরোধী দলের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়। বিরোধী দলের সম্মিলিত পদত্যাগের ফলে সুপ্রীম কোর্টের শরণাপন্ন হওয়া, বিধি মোতাবেক উপনির্বাচন ঘোষণা সংবিধানে নেই বলে বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবীর বিরোধিতা প্রভৃতি চেষ্টার পর, সংবিধান মোতাবেক সংসদ বিলুপ্তির ঘোষণা ইত্যাদি ছিল ক্ষমতাসীন বিএনপির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার প্রয়াস বলে মনে হয়।

অপরদিকে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার দিক দিয়েও বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদীয় সরকার প্রথমটির তুলনায় অধিক দায়িত্বশীল ও কার্যকরী ছিল। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বশীলতা প্রধানত নির্ভর করে শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি এবং তাদের কার্যকর ও গঠনমূলক ভূমিকার উপর। আমরা দেখেছি যে ৭৩-৭৫ সময়ে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অস্তিত্ব ছিল না। সংসদে মহিলাসহ ৩১৫টি আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের আসন ছিল ৩০৭টি। বিরোধী দলের মাত্র ৮টি আসন ছিল। এজন্য বিশেষজ্ঞরা এই সংসদকে এক দলের প্রাধান্য বিশিষ্ট দলীয় ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। এই একক দলীয় আদিপত্যমূলক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছিল সংসদে দলীয় শৃংখলা সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধান। এই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য সরকারী দল স্বাভাবিকভাবে স্বৈরাচারী হয়ে উঠে। এতে আওয়ামী লীগ এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেখ মুজিব তার ক্যারিজমা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা করেন। তিনি তার ব্যক্তিগত ক্ষমতার জোরে সংবিধানের ব্যাপক কাট ছাট করেন এবং ১৯৭৫ সালে সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তণ করেন। এর পিছনে প্রধান কারণ ছিল নিজ দলের ভিতর কোন্দল ও অর্থনৈতিক সংকট।

অপরদিকে দ্বিতীয় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় ছিল একটি শক্তিশালী বিরোধী দল। ১৯৭৩ সালের সরকারী দল আওয়ামী লীগ ১৯৯১ সালের সংসদে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়। শাসক দল বি.এন.পি সামরিক শাসনের মাধ্যমে সৃষ্টি হলেও সংসদীয় সরকারের বিকাশ বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রথম সংসদীয় সরকারের তুলনায় দ্বিতীয় সংসদীয় সরকার দীর্ঘস্থায়ী হলেও এবং শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলেও দায়িত্বশীল সরকারের ভূমিকা আশানুরূপ ভাবে পালন করতে পারেনি। এজন্য সরকারী দল ও বিরোধী দল উভয়ই দায়ী। উভয়ের মধ্যে দেখা গেছে উভয়কে সহ্য না করার মানসিকতা। অথচ সংসদীয় সরকার সফলতার পূর্বশর্তই হলো সহনশীলতা। ত্রয়োদশ অধিবেশন থেকে বিরোধী দল সম্মিলিতভাবে সংসদ থেকে পদত্যাগ করায় বিশেষজ্ঞদের মতে, সংসদ তার বৈধতা হারায়। তবে বিরোধীদের এভাবে একযোগে পদত্যাগ সংসদীয় রীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। কারণ তারা কোন মৌলিক ইস্যুতে পদত্যাগ করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ১

দ্বাদশ সংশোধনীর পূর্ণ বিবরণ

১২. সংশোধনী, দ্বাদশ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ / ২ আশ্বিন, ১৩৯৮

জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ এ রাষ্ট্রপতির সম্মতিদানের পক্ষে গণভোটের ফলাফল নির্বাচন কমিশনের ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ তারিখে ৪(১)/৯১-নিঃ-১/ গণভোট নং প্রজ্ঞাপন মারফত ঘোষিত হওয়ায় সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের (১গ) (অ) দফাবলে নিম্নোক্ত আইনটি অদ্য ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ (২রা আশ্বিন, ১৩৯৮), তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করেছে বলে গণ্য হবে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে :

১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের (অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন) যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ কল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ**

(১) এই আইন সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন ১৯৯১ নামে অভিহিত হবে।

(২) এই আইনের সকল বিধান, ধারা ১৪(খ) এর বিধানসমূহ ব্যতীত, অবিলম্বে বলবৎ হবে এবং ধারা ১৪ (খ) এর বিধানসমূহ ১ চৈত্র ১৩৯৭ মোতাবেক ১৯৯১ সালের ১৬ মার্চ তারিখে বলবৎ হয়েছে বলে গন্য হবে।

২। **সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদের সংশোধন ঃ**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অতঃপর সংবিধান বলে অভিহিত) এর ১১ অনুচ্ছেদের "নিশ্চিত হবে" শব্দগুলির পর "এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হবে। ৩। **সংবিধানের চতুর্থভাগের সংশোধন**। সংবিধানের চতুর্থ ভাগে ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১ম, ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদগুলি প্রতিস্থাপিত হবে, যথা ঃ

"১ম পরিচ্ছেদ রাষ্ট্রপতি"

৪৮। **রাষ্ট্রপতি** ঃ

(১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

(২) রাষ্ট্রপ্রধান রূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁকে প্রদত্ত ও তাঁর ওপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করবেন।

(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁর অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শ দান করেছেন কিনা এবং করে থাকলে কি পরামর্শ দান করেছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্ক কোন প্রশ্নের তদন্ত করতে পারবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি-

(ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন অথবা

(খ) সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য না হন; অথবা

(গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হতে অপসারিত হয়ে থাকেন।

(৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করলে যে কোন বিষয়ে মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।

৪৯। **ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার** ঃ কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দন্ডের মার্জনা, বিলম্ব ও বিরাম মঞ্জুর করবার এবং যে কোন দন্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫০। **রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ ঃ**

(১) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহনের তারিখ হতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তার পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহন না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

(২) একাধিক ক্রমে হউক বা না হউক দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

(৩) স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

(৪) রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যভারকালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন না এবং কোন সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁর কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে।

৫১। **রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি ঃ**

(১) এই সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটিয়ে বিধান করা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোন কাজ করে থাকবেন বা না করে থাকলে সেজন্য তাঁকে কোন আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না, তবে এই দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহনে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্ন করবে না।

(২) রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তাঁর বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার ফৌজদারি কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না এবং তাঁর গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোন আদলত হতে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

৫২। **রাষ্ট্রপতির অভিশংসন ঃ**

(১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যেতে পারবে; এর জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করতে হবে, স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করতে পারবেন।

(৩) অভিযোগ বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকবার এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকবে।

(৪) অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে ঘোষণা করে সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহন করলে প্রস্তাব গৃহীত হবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

(৫) এই সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্পীকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকালে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী এই পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযোজ্য হবে যে, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় স্পীকারের উল্লেখ ডেপুটি স্পীকারের বলে গণ্য হবে এবং (৪) দফার রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবার উল্লেখ স্পীকারের পদ শূন্য হবার উল্লেখ বলে গণ্য হবে এবং (৪) দফায় বর্ণিত কোন প্রস্তাব গৃহীত হলে স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে বিরত থাকবেন।

৫৩। **অসামর্থের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ ঃ**

(১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ হতে অপসারিত করা যাবে, এর জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরযুক্ত অসামর্থের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করতে হবে।

(২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে নোটিশ প্রাপ্তি মাত্র স্পীকার সংসদের অধিবেশন আহ্বান করবেন এবং একটি চিকিৎসা পর্ষদ (অত:পর এই অনুচ্ছেদের পর্ষদ বলে অভিহিত) গঠণের প্রস্তাব আহ্বান করবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হওয়ার পর স্পীকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন এবং তাঁর সাথে এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপনের

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ হতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হওয়ার জন্য উপস্থিত হন।

(৩) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদানের পর হতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেয়া যাবে না এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহ্বানের প্রয়োজন হলে স্পীকার সংসদ আহ্বান করবেন।

(৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হওয়ার কালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকবার এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকবে।

(৫) প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার জন্য উপস্থিত না হয়ে থাকলে প্রস্তাবটি ভোটে দেয়া যেতে পারবে এবং সংসদে মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দু'তৃতীয়াংশ ভোটে তা গৃহীত হলে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

(৬) অপসারণের জন্য প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকলে সংসদের নিকট পর্ষদের মতামত পেশ করবার সুযোগ না দেয়া পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দেয়া যাবে না।

(৭) সংসদ কর্তৃক প্রস্তাবটি ও পর্ষদের রিপোর্ট (যা এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে পরীক্ষিত সাত দিনের মধ্যে দাখিল করা হবে এবং অনুরূপভাবে দাখিল না করা হলে তা বিবেচনার প্রয়োজন হবে না। বিবেচিত হওয়ার পর সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হলে গৃহীত হওয়ার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

৫৪। **অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পীকার:** রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ- প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

৫৫। **মন্ত্রিসভা ঃ**

(১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী সময়ে সময়ে যেরূপ স্থির করবেন, সেরূপ অন্যান্য মন্ত্রী নিয়ে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হবে।

(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁর কর্তৃত্বে এ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে।

(৩) মন্ত্রীসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন।

(৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে।

(৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমানীকৃত হবে, রাষ্ট্রপতি তা বিধিসমূহ দ্বারা নির্ধারণ করবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমানীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয়নি বলে তাঁর বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করবেন।

৫৬। **মন্ত্রিগণ ঃ**

(১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী থাকবেন।

(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, তাঁদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ সদস্যগণের মধ্য হতে নিযুক্ত হবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হতে মনোনীত হতে পারবেন।

(৩) সংসদ সদস্যদের মধ্যে যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবেন, রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন।

(৪) সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া এবং সংসদ সদস্যদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) দফার অধীন নিয়োগ দানের প্রয়োজন দেখা দিলে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে যারা সংসদ সদস্য ছিলেন, এই দফার উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তাঁরা সদস্যরূপে বহাল রয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭। **প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ ঃ**

(১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হবে, যদি-

(ক) তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা

(খ) তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন।

(২) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন কিংবা সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শ দান করলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোন সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নন এ মর্মে সন্তুষ্ট হলে, সংসদ ভেঙ্গে দিবেন।

(৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহন না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অযোগ্য করবেন না।

৫৮। **অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ ঃ**

(১) প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রীর পদ শূন্য হবে, যদি-

ক) তিনি রাষ্টপতির নিকট পেশ করবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন;

খ) তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন, তবে ৫৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার শর্তাংশের অধীনে মনোনীত মন্ত্রীর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না।

গ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে রাষ্ট্রপতি অনুরূপ নির্দেশ দান করেন; অথবা

ঘ) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফায় যেরূপ বিধান করা হয়েছে তা কার্যকর হয়।

(২) প্রধানমন্ত্রী যে কোন সময়ে কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করতে পারবেন এবং উক্ত বা অনুরূপ অনুরোধ পালনের অসমর্থ হলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রীর নিয়োগের অবসান ঘটাবার পরামর্শ দান করতে পারবেন।

(৩) সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় যে কোন সময়ে মন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকতে এই অনুচ্ছেদের (১) দফার (ক), (খ) ও (ঘ) উপ-দফার কোন কিছুই অযোগ্য করবেন না।

(৪) প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকে পদত্যাগ করছেন বলে গণ্য হবে, তবে এই পরিচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে তাদের উত্তরাধিকারীগণ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁরা স্ব-স্ব পদে বহাল থাকবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) এই অনুচ্ছেদে "মন্ত্র" বলতে প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত।

৩য় পরিচ্ছেদ- স্থানীয় শাসন

৫৯। **স্থানীয় শাসন ঃ**

(১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে।

(২) এই সংবিধান বা অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেরূপ দায়িত্ব পালন করবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে ঃ

ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;

খ) জনশৃংখলা রক্ষা;

গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৬০। **স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ঃ**

এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানবলীতে পূর্ণ কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষনের ক্ষমতা প্রদান করবেন।

অন্যান্য ধারার সংশোধন

৪। **সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন ঃ** সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২ক) দফায় "উপ-রাষ্ট্রপতি," এবং "উপ-প্রধানমন্ত্রী," শব্দগুলো ও কমাগুলো বিলুপ্ত হবে।

৫। **সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন ঃ** সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হবে, যথা-

Dhaka University Institutional Repository

৭০। **পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে আসন শূন্য হওয়া ঃ**

(১) কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোন ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি উক্ত দল হতে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদের উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহলে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে।

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোন সংসদ সদস্য যে দল তাঁকে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করেছেন, সেই দলের নির্দেশ অমান্য করেন-

ক) সংসদে উপস্থিত থেকে ভোটদানে বিরত থাকেন, অথবা

খ) সংসদের কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেছেন বলে গণ্য হবেন।

(২) যদি কোন সময় কোন রাজনৈতিক দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্বে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে তাহলে সংসদে সে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্বের দাবীদার কোন সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত হওয়ার সাত দিনের মধ্যে স্পীকার সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী উক্ত দলের সকল সংসদ সদস্যের সভা আহ্বান করে বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করবেন এবং সংসদে ভোটদানের ব্যাপারে অনুরূপ নির্ধারিত নেতৃত্বের নির্দেশ যদি কোন সদস্য অমান্য করেন তাহলে তিনি (১) দফার অধীন উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং সংসদে তার আসন শূন্য হবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থীরূপে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন, তাহলে তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

৬। **সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের সংশোধন ঃ** সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (ক) (১) দফার শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশগুলো প্রতিস্থাপিত হবে, যথা- "তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন তার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) ৪ (ক) দফা বিলুপ্ত হবে।"

৭। **সংবিধানের ৭৩ ক অনুচ্ছেদের সংশোধন ঃ** সংবিধানের ৭৩ ক অনুচ্ছেদে-

(ক) ১ দফায় শেষে "পারবেন না" শব্দগুলোর পর "এবং তিনি কেবল তাঁর মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে পারবেন" শব্দগুলো সন্নিবেশিত হবে, এবং (খ) (২) দফায় উপ-প্রধানমন্ত্রী শব্দটি বিলুপ্ত হবে।

৮। **সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন ঃ** সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের (ক ক) দফা বিলুপ্ত হবে।

৯। **সংবিধানের ৯২ অনুচ্ছেদের সংশোধন ঃ** সংবিধানের ৯২ অনুচ্ছেদের (২) দফার পর নিম্নরূপ নতুন দফা সংযোজিত হবে, যথা-

(৩) এই পরিচ্ছেদের উপরিউক্ত বিধানাবলীতে যা বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও যদি কোন অর্থ বছর প্রসঙ্গে সংসদ-

(ক) উক্ত বছর আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এ সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরীদান এবং ৯০ অনুচ্ছেদের অধীন আইন গ্রহনে অসমর্থ হয়ে থাকে এবং এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অগ্রিম মঞ্জুরীদান না করে থাকে, অথবা

খ) কোন ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন মেয়াদের জন্য কোন অগ্রিম মঞ্জুরী দেওয়া হয়ে থাকে সে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে ৮৯ অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরীদানে এবং ৯০ অনুচ্ছেদের অধীন আইন গ্রহণে অসমর্থ হয়ে থাকে,

তাহলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে, আদেশের দ্বারা অনুরূপ মঞ্জুরীদান না করা এবং আইন গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত, ঐ বছরের অনধিক ষাট দিন মেয়াদ পর্যন্ত উক্ত বছরের আর্থিক বিবৃতিতে উল্লেখিত ব্যয় নির্বাহের জন্য সংযুক্ত, তহবিল হতে অর্থ প্রত্যাহারের কর্তৃত্ব প্রদান করতে পারবেন।

১০। **সংবিধানের ৯২ ক অনুচ্ছেদের বিলোপ ঃ** সংবিধানের ৯২ ক অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হবে।

১১। **সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন ঃ** সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদে "আদালতের" শব্দটির পরিবর্তে আদালত ও ট্রাইব্যুনালের শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে।

১২। **সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন ঃ** সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের (১) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হবে, যথা ঃ "(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার

Dhaka University Institutional Repository

তালিকা প্রস্তুত করণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং নির্বাচন কমিশন এ সংবিধান ও আইননানুযায়ী-

ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন;

খ) সংসদ সদস্যদের নির্বাচন করবেন;

গ) সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করবেন; এবং

ঘ) রাষ্ট্রপতি পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন।"

১৩। **সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের সংশোধন** ঃ সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের-

ক) (১) দফায় রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদের **11** **শব্দগুলো বিলুপ্ত হবে;**
3

খ) (৩) দফা বিলুপ্ত হবে।

১৭। **সংবিধানের ১৪১ক অনুচ্ছেদের সংশোধন** ঃ সংবিধানের ১৪১ক অনুচ্ছেদের (১) দফার শেষে দাড়ির পরিবর্তে একটি কোলন প্রতিস্থাপিত হবে এবং তৎপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হবে যথা:

"তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য ঘোষণার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।"

১৮। **সংবিধানের ১৪১গ অনুচ্ছেদের সংশোধন** ঃ সংবিধানের ১৪১গ অনুচ্ছেদের (১) দফায় "কার্যকারিতা কালে রাষ্ট্রপতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "কার্যকারিতাকালে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে।

১৯। **সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের সংশোধন** ঃ সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে-

(ক) (১ক) দফায় ৫৬ সংখ্যাটির পূর্বে "৫৮, ৮০ বা ৯২ক" কমাগুলি, সংখ্যাগুলি ও শব্দটি বিলুপ্ত হবে।

(খ) (১খ) দফায় "রাষ্ট্রপতির পদে" শব্দগুলির পরিবর্তে "সংসদ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হবে।

(ঘ) (গ) (১গ) দফার পর নিম্নরূপ নূতন (১ঘ) দফা সন্নিবেশিত হবে যথা

"(১ঘ) (১গ) দফার কোন কিছুই মন্ত্রিসভা বা সংসদের উপর আস্থা বা অনাস্থা বলে গণ্য হবে না।**

Dhaka University Institutional Repository

২০। **সংবিধানের ১৪৫ক অনুচ্ছেদের সংশোধন ঃ** সংবিধানের ১৪৫ক অনুচ্ছেদের শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশটি প্রতিস্থাপিত হবে যথা ঃ

২৪। **সংবিধানে তৃতীয় তফসিলের সংশোধন ঃ** সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে,

ক) ফরম ১ক বিলুপ্ত হবে, এবং

খ) ফরম ২-এর শিরোণামায়, "উপ-প্রধানমন্ত্রী" কমাটি ও শব্দটি বিলুপ্ত হবে।

২৫। **সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের সংশোধন ঃ** সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের-

ক) ২০ অনুচ্ছেদের বিলুপ্ত হবে। এবং

খ) ২১ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ ২২ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হবে, যথাঃ

"২২! সংবিধানে যাহা কিছু থাকুক না কেন, সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (আন নং ২৮, ১৯৯১) প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে সংসদ কর্মরত ছিল উহা সংবিধান ও আইন অনুযায়ী যথাযথভাবে নির্বাচিত ও গঠিত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং উহা সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী বহাল থাকবে।

খোন্দকার আব্দুল হক

যুগ্ম-সচিব

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

ত্রয়োদশ সংশোধনীর পূর্ণ বিবরণ

ঢাকা, ২৮ মার্চ ১৯৯৬ / ১৪ ই চৈত্র, ১৪০২

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৮ মার্চ, ১৯৯৬ (১৪ চৈত্র, ১৪০২) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে ঃ

১৯৯৬ সনের ১নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ঃ

যেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হলো ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা** ঃ এই আইন সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হবে।

২। সংবিধানের নূতন ৫৮ক অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অত:পর সংবিধান বলে উল্লেখিত) এর ৫৮ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হবে যথাঃ ৫৮-খ, ৫৮-গ, ৫৮-ঘ এবং ৫৮-ঙ।

৫৮-খ। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে,

(১) সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর বা সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহন করেন সে তারিখ হতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যভার গ্রহনের তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবেন।

(৩) ১ দফায় উল্লেখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা বা তাঁর কর্তৃত্বে প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী কাজ পরিচালিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) সংবিধানের ৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল নির্বাহী কাজ রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে; সকল আদেশ ও চুক্তিপত্র রাষ্ট্রপতি বিধিসমূহ দ্বারা নির্ধারণ করবেন এবং সে সব ক্ষেত্রে আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধি প্রণয়ন করবেন।

৫৮-গ। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন ও উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ঃ

(১) প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতির দ্বারা তাঁরা নিযুক্ত হবেন।

(২) সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার বা ভঙ্গ হওয়ার পরবর্তী পঁনের দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হবেন। প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টগণ নিযুক্ত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত অব্যবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) সুপ্রীম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত এবং উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। তবে তিনি রাজি না হলে বা পাওয়া না গেলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত এবং উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

(৪) যদি কোন প্রধান বিচারপতি রাজি না হন বা পাওয়া না যায় তবে আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এবং উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য সর্বশেষ বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। যদি তিনি রাজী না হন তাহলে, তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

(৫) যদি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারককে পাওয়া না যায় তবে রাষ্ট্রপতি দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্য এরূপ বাংলাদেশী কোন নাগরিককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

(৬) যদি ৩, ৪ ও ৫ দফায় বর্ণিত বিধান কার্যকরী করা না হয় তবে রাষ্ট্রপতি নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

(৭) উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতা ঃ কোন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হতে হলে-

(ক) সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) কোন রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অংগীভূত কোন সংগঠনের সদস্য হওয়া চলবে না।

(গ) সংসদের আসন্য নির্বাচনের প্রার্থী নন বা হবেন না, এ মর্মে লিখিত অঙ্গিকার দিতে হবে এবং

(ঘ) বাহাত্তর বছরের অধিক বয়স্ক হওয়া চলবে না।

(৮) রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণকে নিয়োগ করবেন।

(৯) রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

(১০) তাছাড়া নিয়োগের যোগ্যতা হারালে কেউ স্বীয় পদে বহাল থাকতে পারবেন না।

(১১) প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও পারিশ্রমিক এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন। উপদেষ্টাগণ মন্ত্রির পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন।

(১২) নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে কার্যভার গ্রহণ করবেন সে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হবে।

৫৮-ঘ। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলী ঃ

(১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করবেন এবং প্রয়োজন ব্যতীত নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নিবেন না।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

৫৮-ঙ। সংবিধানের কতিপয় বিধানের অকার্যকরতা ঃ

সংবিধান সংশোধনের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বা তাঁর প্রতিস্বাক্ষর গ্রহনপূর্বক কার্য করবার বিধানসমূহ অকার্যকর হবে।

৬১। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ঃ

ত্রয়োদশ সংশোধনী মোতাবেক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান থাকবেন এবং আইনানুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালে অনুরূপ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রযুক্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাস হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকারের তালিকা

জাতীয় সংসদ সদস্য

	নাম ও পদবী	তারিখ
১।	আলহাজ্ব আতাউর রহমান খান জাতীয় সংসদ সদস্য নারায়নগঞ্জ-২	৪/৩/২০০৬
২।	মুফতী মাওলানা আঃ সাত্তার জাতীয় সংসদ সদস্য বাগেরহাট-৪	৪/৩/২০০৬
৩।	আলহাজ্ব মোঃ আলী কদর জাতীয় সংসদ সদস্য	৪/৩/২০০৬
৪।	গাজী মোহাম্মদ শাহজাহান জাতীয় সংসদ সদস্য	৭/৩/২০০৬
৫।	ডাঃ জিয়াউল হক মোল্লা জাতীয় সংসদ সদস্য	৭/৩/২০০৬
৬।	আলহাজ্ব মোশারফ হোসেন মঞ্জু জাতীয় সংসদ সদস্য বরিশাল-৩	১০/৩/২০০৬
৭।	শাহজাহান খান জাতীয় সংসদ সদস্য মাদারীপুর-২	১০/৩/২০০৬
৮।	নজির হোসেন জাতীয় সংসদ সদস্য	১৫/৩/২০০৬
৯।	কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন জাতীয় সংসদ সদস্য সুনামগঞ্জ-৫	১৫/৩/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

'শিক্ষক'

	নাম ও পদবী	তারিখ
১।	এ. কে. এম ফখরউদ্দিন মোল্লা সহকারী অধ্যাপক সোনারগাঁও ডিগ্রী কলেজ, নারায়নগঞ্জ।	১০/০১/২০০৬
২।	আবুল আফছার সহকারী অধ্যাপক সোনারগাঁও ডিগ্রী কলেজ, নারায়নগঞ্জ।	১০/০১/২০০৬
৩।	কাজী নুরুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক সোনারগাঁও ডিগ্রী কলেজ, নারায়নগঞ্জ।	১০/০১/২০০৬
৪।	মনোজ কুমার ওঝা সহকারী অধ্যাপক সোনারগাঁও ডিগ্রী কলেজ, নারায়নগঞ্জ।	১০/০১/২০০৬
৫।	মোঃ আইনুল হাকিম প্রভাষক সোনারগাঁও ডিগ্রী কলেজ, নারায়নগঞ্জ।	১২/০১/২০০৬
৬।	মোঃ আবু তাহের সরকার প্রভাষক কাজী ফজলুল হক উইমেন্স কলেজ, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।	১৫/০১/২০০৬
৭।	মামুন মাহমুদ প্রভাষক কাজী ফজলুল হক উইমেন্স কলেজ, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।	১৫/০১/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

	নাম ও পদবী	তারিখ
৮।	মোঃ এমদাদুল হক নূর সহকারী অধ্যাপক কাজী ফজলুল হক উইমেন্স কলেজ, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।	১৫/০১/২০০৬
৯।	মনোজ কুমার অধিকারী সহকারী অধ্যাপক কাজী ফজলুল হক উইমেন্স কলেজ, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।	১৫/০১/২০০৬
১০।	হেলেনা বেগম প্রভাষক কাজী ফজলুল হক উইমেন্স কলেজ, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।	১৫/০১/২০০৬
১১।	তানিয়া জাহান প্রভাষক কাজী ফজলুল হক উইমেন্স কলেজ, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।	১৭/০১/২০০৬
১২।	সালেহা আক্তার শিরিন প্রভাষক কাজী ফজলুল হক উইমেন্স কলেজ, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।	১৭/০১/২০০৬
১৩।	ফাহমিদা হক প্রভাষক কাজী ফজলুল হক উইমেন্স কলেজ, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।	১৭/০১/২০০৬
১৪।	মোঃ মাহিবুর রহমান প্রভাষক জি. আর ইনস্টিটিউশন, নারায়নগঞ্জ।	২০/০১/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

	নাম ও পদবী	তারিখ
১৫।	মোঃ সুলতান মিয়া প্রভাষক জি. আর ইনস্টিটিউশন, নারায়নগঞ্জ।	২০/০১/২০০৬
১৬।	মোঃ মজিবুর রহমান প্রভাষক জি. আর ইনস্টিটিউশন, নারায়নগঞ্জ।	২০/০১/২০০৬
১৭।	খন্দকার হাছিনা তানজিন প্রভাষক জি. আর ইনস্টিটিউশন, নারায়নগঞ্জ।	২০/০১/২০০৬
১৮।	সালমা বেগম প্রভাষক জি. আর ইনস্টিটিউশন, নারায়নগঞ্জ।	২০/০১/২০০৬
১৯।	ফরিদা ইয়াছমিন প্রভাষক জি. আর ইনস্টিটিউশন, নারায়নগঞ্জ।	২০/০১/২০০৬
২০।	সাবিনা ইয়াসমিন প্রভাষক জি. আর ইনস্টিটিউশন, নারায়নগঞ্জ।	২০/০১/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

'আইনজীবী'

	নাম ও পদবী	তারিখ
১।	মোঃ ফজলুল হক ভূঁইয়া আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	১৮/০৪/২০০৬
২।	নারায়ন চন্দ্র ঘোষ আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	১৮/০৪/২০০৬
৩।	বজলুল হক আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	১৮/০৪/২০০৬
৪।	আলহাজ্ব আঃ রাজ্জাক ভূঁইয়া আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	১৮/০৪/২০০৬
৫।	গিয়াসউদ্দীন আহমেদ আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	১৮/০৪/২০০৬
৬।	সুলতান মাহমুদ আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	১৮/০৪/২০০৬
৭।	আহছান হাবীব আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	১৮/০৪/২০০৬
৮।	মোঃ আনোয়ার হোসেন আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	১৮/০৪/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

	নাম ও পদবী	তারিখ
৯।	এম. এ ওহাব আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	২০/৪/২০০৬
১০।	মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	২০/৪/২০০৬
১১।	মোঃ আশরাফুল আমিন আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	২০/৪/২০০৬
১২।	এম. এম আলতাফ আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	২৪/৪/২০০৬
১৩।	মোঃ মনিরুজ্জামান বুলবুল আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	২৪/৪/২০০৬
১৪।	মোঃ শহীদুল ইসলাম লিটন আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	২৪/৪/২০০৬
১৫।	এম. এম শামীম হোসেন আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	১৮/০৪/২০০৬
১৬।	আবু করিম রওনক চৌধুরী আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	১৮/০৪/২০০৬
১৭।	মোঃ খোরশেদুল আলম আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	১৮/০৪/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

	নাম ও পদবী	তারিখ
১৮।	মোঃ আলমাস হোসেন আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	১৮/০৪/২০০৬
১৯।	আলহাজ্ব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	১৮/০৪/২০০৬
২০।	মোঃ লুৎফর রহমান দুলু আইনজীবী নারায়নগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট।	১৮/০৪/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

'সাংবাদিক'

	নাম ও পদবী	তারিখ
১।	প্রতীক ইজাজ স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক সমকাল	২/৫/২০০৬
২।	জামিউল আহসান সিপু স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক যুগান্তর	২/৫/২০০৬
৩।	নাজির উদ্দীন শোয়েব স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক আমার দেশ	২/৫/২০০৬
৪।	উম্মুল ওয়ারা সুইটি স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক সমকাল	২/৫/২০০৬
৫।	দীপু সরোয়ার স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক সংবাদ	৪/৫/২০০৬
৬।	ফয়সাল আলম স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক দিনকাল।	৪/৫/২০০৬
৭।	আশুতোষ সরকার রিপোর্টার বিডি নিউজ, কাওরান বাজার।	৪/৫/২০০৬
৮।	শাহজাহান আকন্দ শুভ স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক আমাদের সময়।	৪/৫/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

	নাম ও পদবী	তারিখ
৯।	গাজী শফিকুল ইসলাম বার্তা সম্পাদক দৈনিক শক্তি	৪/৫/২০০৬
১০।	নাজমুল আহসান রাজু স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক সংগ্রাম	৭/৫/২০০৬
১১।	মোঃ ফরিদ উদ্দীন সিদ্দিকী প্রধান প্রতিবেদক বাংলাদেশ ফোকাস নিউজ সার্ভিস মিডিয়া	৭/৫/২০০৬
১২।	মিজান মাহমুদ যুগ্ম বার্তা সম্পাদক (মফস্বল) দৈনিক ভোরের ডাক	৭/৫/২০০৬
১৩।	ফারাজী আজমল হোসেন সিনিয়র রিপোর্টার দৈনিক ইত্তেফাক	৭/৫/২০০৬
১৪।	মমিনুল হক আজাদ স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক যুগান্তর	৯/৫/২০০৬
১৫।	জাফির হোসাইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক দৈনিক নয়া দিগন্ত	৯/৫/২০০৬
১৬।	মোঃ কালাম সরকার বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার দৈনিক যায় যায় দিন	৯/৫/২০০৬
১৭।	আশরাফুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার দৈনিক সংবাদ	১২/৫/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

	নাম ও পদবী	তারিখ
১৮।	ইমামুল হক শামীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি সাধারণ সম্পাদক, বি. এম. এস.	১২/৫/২০০৬
১৯।	দাউদ মোঃ ঈসা Dhaka University Correspondent The Bangladesh Today	১২/৫/২০০৬
২০।	জান্নাতুল ফেরদাউস রিপোর্টার বিডি নিউজ, কাওরান বাজার।	১২/৫/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

'ছাত্র'

	নাম ও পদবী	তারিখ
১।	শাহীনূর ডানা ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	৮/০২/২০০৬
২।	মেঘনাথ সরকার ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	৮/০২/২০০৬
৩।	মোঃ আরিফুর রহমান ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	৮/০২/২০০৬
৪।	মোঃ মাহমুদুন নবী ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	৮/০২/২০০৬
৫।	মেহেদী হাসান ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	১২/০২/২০০৬
৬।	মোঃ নুর ইসলাম ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	১২/০২/২০০৬
৭।	বশির ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	১২/০২/২০০৬
৮।	অন্তিপা দত্ত ছাত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	১২/০২/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

	নাম ও পদবী	তারিখ
৯।	নাজিয়া খান ছাত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	১২/০২/২০০৬
১০।	রুমানা পরভীন ছাত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	১৫/০২/২০০৬
১১।	নিমাই চন্দ্র ভৌমিক ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	১৫/০২/২০০৬
১২।	জাকিয়া সুলতানা ছাত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	১৫/০২/২০০৬
১৩।	মোঃ তায়েফুর রহমান ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	১৫/০২/২০০৬
১৪।	আশফাকুর রহমান ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	১৫/০২/২০০৬
১৫।	মোঃ জহিরুল ইসলাম ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	২৫/০২/২০০৬
১৬।	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	২৫/০২/২০০৬
১৭।	মশিউর রহমান ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	২৫/০২/২০০৬
১৮।	টুটন ধর ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	২৫/০২/২০০৬
১৯।	সৈয়দ আঃ মতিন ছাত্র, ঢাকা কলেজ।	২৫/০২/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

	নাম ও পদবী	তারিখ
২০।	মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	২৫/০২/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতাদের জন্য নির্বাচিত প্রশ্নমালা

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ভূমিকা ও কার্যকারিতা (১৯৯১-১৯৯৬) প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ভূমিকা ও কার্যকারিতা (১৯৯১-১৯৯৬) প্রেক্ষিত বাংলাদেশের জন্য প্রশ্নমালা।

গবেষণা কর্মটি সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থানে সুচিন্তিত মতামত লিখুন।

(সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবল মাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।)

সুপারভাইজারের স্বাক্ষর ও তারিখ **তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ**

১। উত্তরদাতার নাম ঃ

২। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

৩। উত্তরদাতার পদবী ঃ

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ☐ এস. এস.সি. ☐ এইচ. এস. সি.

☐ স্নাতক পাস ☐ স্নাতক (সম্মান)

☐ স্নাতকোত্তর তদুর্দ্ধ

৫। কেবলমাত্র আইন সভার সদস্যদের ক্ষেত্রে ঃ

ক) পার্লামেন্টের পদ এবং অবস্থান .....

খ) মন্ত্রী পরিষদের পদ এবং অবস্থান .....

গ) দলীয় পদ এবং অবস্থান .....

ঘ) সংসদীয় অভিজ্ঞতা .....

ঙ) রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা .....

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নমালা

১। কমিটি সমূহের রিপোর্ট এবং সুপারিশ কদাচিৎ বাস্তবায়নে সরকারের স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতা কতোটুকু সুনিশ্চিত হয়েছে।

☐ সম্পূর্ণ ☐ মোটেই না ☐ অধিকাংশ ☐ আংশিক ☐ মোটামুটি

মন্তব্য ঃ .....

.....

.....

২। পঞ্চম সংসদে প্রায় এক তৃতীয়াংশ অধ্যাদেশ সংক্রান্ত আইন পাশ কি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে? (টিক চিহ্ন দিন) ☐ হ্যাঁ ☐ না ☐ জানি না।

মন্তব্য ঃ.....

.....

.....

৩। পঞ্চম সংসদে উপনির্বাচনগুলো কি অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছিল?

☐ হ্যাঁ ☐ না ☐ অধিকাংশ ☐ আংশিক ☐ মোটামুটি

৪। সংসদ থেকে বিরোধী দলগুলোর একযোগে পদত্যাগই কি ছিলো একমাত্র পথ?

☐ হ্যাঁ ☐ না

মন্তব্য ঃ .....

.....

.....

Dhaka University Institutional Repository

৫। বিরোধীদের সংসদ থেকে পদত্যাগের পর সরকারী দলের কি উচিৎ ছিলো সংসদ ভেঙ্গে দেয়া?

☐ হ্যাঁ ☐ না

মন্তব্য ঃ .....

.....

.....

৬। ষষ্ঠ পার্লামেন্ট নির্বাচনও কি অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিলো?

☐ হ্যাঁ ☐ না ☐ অধিকাংশ ☐ আংশিক ☐ মোটামুটি

৭। বিরোধী দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কি গণতান্ত্রিক ছিলো?

☐ হ্যাঁ ☐ না

৮। বিরোধী দলগুলো কেবলমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করে উহা কতোটুকু সত্য।

☐ সম্পূর্ণ ☐ অধিকাংশ ☐ আংশিক ☐ মোটামুটি

☐ মোটেই না ☐ জানি না

৯। পঞ্চম পার্লামেন্টের কার্যপ্রণালী সংসদীয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছিলো কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না ☐ অধিকাংশ ☐ আংশিক ☐ মোটামুটি

১০। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হয়েও উহার বাস্তবায়ন হচ্ছে না কেন?

ক) সরকারের দায়িত্বশীলতার অভাব;

খ) বিরোধী দল সঠিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ;

গ) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা;

ঘ) আমলাদের প্রাধাণ্য;

ঙ) রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহযোগিতার অভাব;

চ) জনগণের সচেতনতার অভাব ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

BIBLIOGRAPHY

আহমেদ আবুল মনসুর, **আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর**, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮৪।

আহমেদ এমাজউদ্দীন, (সম্পাদিত), **বাংলাদেশে সংসদীয় গনতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা**, করিম বুক করপোরেশন, ঢাকা, মে ১৯৯২, পৃষ্ঠা-২।

----------, **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা**, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ঢাকা, জুন, ১৯৯৪।

----------, **বাংলাদেশ ঃ সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি**, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

আবুল হোসেন আলহাজ সৈয়দ, **গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সংকট**, প্রশাসক মোঃ আব্দুল কাদের, কবি জসীম উদ্দীন রোড, পৃষ্ঠাঃ ২২।

----------, **গনতন্ত্র, নেতৃত্ব ও উন্নয়ন**, প্রশাসক মোঃ আব্দুল কাদের, ১৬ কবি জসীম উদ্দীন রোড, পৃষ্ঠাঃ ৯১।

আজাদ লেনিন, **উনসত্তরের গন-অভ্যুত্থান, রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি**, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৭।

আকবর সৈয়দ আলী, **সংসদীয় গনন্ত্রের চর্চা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ**, ঢাকা রিলায়্যাবল কম্পিউটার্স, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃষ্ঠাঃ ১৮।

আহমেদ মওদুদ, **বাংলাদেশঃ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল**, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৮৭ ইং।

আহমেদ কামরুদ্দীন, **স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতপর**, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮২।

আহমেদ কামাল উদ্দিন, **সংসদীয় গনতন্ত্র বিরোধী দলের ভূমিকা**, অধ্যাপক এমাজ উদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), **বাংলাদেশে সংসদীয় গনতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা**, করিম বুক করপোরেশন, ঢাকা, মে ১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লাহ আহম্মদ, (সম্পাদিত) **পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামান্য গ্রন্থ**, সূচয়ন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২।

ওমর বদরুদ্দীন, **বাংলাদেশের গনতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র**, মওলা ব্রাসার্স, ১৯৯৪।

----------, **পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি**, খন্ড ১ ও ২, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭০।

করিম সরদার ফজলুল, **দর্শনকোষ**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

কামাল মোস্তফা, **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা**, বাংলাদেশের ২৫ বৎসর কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।

খান নিয়াজ আহম্মেদ, মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, আনম মুনির আহম্মেদ, **"জবাবদিহিতা, নীতি নির্ধারণ ও সংসদীয় কমিটি,"** বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, উন্নয়ন বিতর্ক ত্রৈমাসিক জার্নাল অষ্টাদশ বর্ষ জুন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠাঃ ৭৫।

চক্রবর্তী, মত্যসাধন ও নিমাই প্রামানিক, **রাষ্ট্রবিজ্ঞান**, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৭৯।

----------, **নির্বাচিত আধুনিক শাসন ব্যবস্থা**, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, জুলাই ১৯৮০, পৃষ্ঠাঃ ১৩০।

চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক কানাইলাল, **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রূপরেখা**, কলকাতা, পাইওনিয়ার প্রিন্টিং ওয়াকার্স, অক্টোবর, ১৯৮০, পৃষ্ঠাঃ ৩৫০।

ফিরোজ জালাল, **পার্লামেন্টারী শব্দকোষ**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

ফজল ড. আব্দুল, ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান ও ড মোহাম্মদ মফসুদুর রহমান, **রাষ্ট্রবিজ্ঞান তত্ত্ব ও নীতিমালা**, রাজশাহী, বুকস প্যাভিলিয়ন, জুন ১৯৯০, পৃষ্ঠাঃ ১১৬।

বালা হীরালাল, **বাংলাদেশের দারিদ্রঃ অতীত ও বর্তমান**, তারেক সামসুর রহমান, **বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর**, মওলা ব্রাসার্স, ১৯৯৯, পৃষ্ঠাঃ ১৮৮।

ভূঁইয়া ড. মোঃ আব্দুল ওদুদ, **বাংলাদেশের দলীয় ব্যবস্থাঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ**, ঢাকা, গ্লোব লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, [দ্বিতীয় সংস্করণ], ১৯৯৩ ইং।

----------, **সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা**, ঢাকা, আজিজিয়া বুক ডিপো [দ্বিতীয় প্রকাশ] ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

------------------------,	**বাংলাদেশের অর্থনীতি**, ঢাকা, আজিজিয়া বুক ডিপো [দ্বিতীয় সংস্করণ] ১৯৯৮।
------------------------,	**বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন**, আজিজিয়া বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৭ এপ্রিল, ১৯৮৯, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৮।
মিয়া এম এ ওয়াজেদ,	**বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র**, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ, পৃষ্ঠাঃ ১৪৫, ১৯৯৪।
মাহমুদ আনু,	"শিল্পায়নে বিলম্বিত পদক্ষেপ আত্মঘাতিমূলক হতে পারে," **দৈনিক খবর**, ১৯৯৪।
রহমান মাহবুবুর,	"সংসদীয় গনতন্ত্র ও সরকারের দায়িত্বশীলতা," অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), **বাংলাদেশে সংসদীয় গনতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা**, ঢাকা করিম বুক কর্পোরেশন, মে ১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ৬৭।
রহমান শামসুর,	**"রাজনৈতিক দল যেন সন্ত্রাসীদের অভয়াশ্রম না হয়"** বাংলার বাণী, ঢাকা, নভেম্বর ৩, ১৯৯১, পৃষ্ঠাঃ ৪।
হাসানুজ্জামান আল মাসুদ,	**"বাংলাদেশ কমিটি ব্যবস্থা"** মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত **"গনতন্ত্র"** গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠাঃ ১২৬।
----------------------,	**নবপ্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা**, ঢাকা, অক্ষর ১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ৫৩।
হালিম মোঃ আবদুল,	**সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতিঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ**, প্রকাশনঃ মোঃ ইফসুফ আলী খান, গুলশান, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠাঃ ১৮১।
হক আবুল ফজল,	**বাংলাদেশের রাজনীতিঃ সংঘাত ও পরিবর্তন**, সুদীপ্ত প্রিন্টার্স এ্যান্ড প্যাকেজেস লিঃ, ঢাকা, জানুয়ারী, ১৯৯৪, পৃষ্ঠাঃ ৩৪২।
--------------------------,	**বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৪।
Ahmed Kamruddin,	**A Socio Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh Inside Library**, Dhaka, 1975.

Dhaka University Institutional Repository

Ahmed Emazuddin, (ed.), **Society and Political in Bangladesh**, Academic Publishers, Dhaka, 1987.

Ahmed Moudud, **Era of Sheikh Mujibur Rahman** UPL.

Ahmed N, "**Committees in the Bangladesh Parliament**," Legislature Studies, 1998, Vol-13, No.-4, P-19.

Ahmed Mustaq, **Government and Politics in Pakistan**, Pakistan Publishing House, Karachi, 1963.

Ball Allen, **Modern Politics and Government**, The Macmillan Press Ltd. (ed.) 1977. Printed in Great Britain, By Richard Clay Limited, Bergway Suffolk, P-56.

Ball Allen R, **Modern Politics and Government**, London, The Macmillan Press Ltd, 1981, P-156.

Brand Jach, **British Parliament Parties**, Policy and Power, Clarendon Press Oxford, New York, 1992.

Bromhead P. A., **Private Members Bill in the British Parliament**, Routledge and Kegan Paul, 1956.

Choudhury Dilara, **Constitutional Development in Bangladesh**, Stresses and Strains, UPL, Dhaka, 1995.

Cook Chris, **Macmillan Dictionary of Historical Terms**, Second Edition, Macmillan Reference Books, London, 1989.

Callard Keith, **Pakistan: A Political**, George Allen and Unwin Ltd. 1968.

Choudhury G. W., **Democracy in Pakistan**, Green Book House, Dhaka, 1963.

----------, **Constitutional Development in Pakistan**, Longmans, Lahore, 1959.

Dhaka University Institutional Repository

Chaudhuri Muzaffar Ahmed, **Government and Politics in Pakistan**, Puthighar Ltd., Dhaka, 1968.

Dye Thomas R., **Governing the American Democracy**, St. Martin's Press, New York, 1980.

Dragnich Alex N, **Major European Government**, Third Edition, Illinois: Dorsey Press, 1974.

Gupta D.C., **Indian National Movement and Constitutional Development**, Delhi, 1973.

Harris Fred R, **American's Democracy**, University of New Mexico Press, 1983.

Harun Shamsul Huda, **Parliamentary Behavior in a Multi-National State 1947-58: Bangladesh Experience**, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1984.

Hussain Shawkat Ara, **Politics and Society in Bengal**, Bangla Academy, Dhaka, 1991.

Islam Nazrul, **Parliamentary Democracy in Bangladesh**; An Assessment, Perspective in Social Science Review, Vol- 5, No. 1, 1997, Page-5.

Jahan Rounaq, **Pakistan: Failure in National Integration**, University Press Limited, Dhaka, 1977.

----------, **Bangladesh Politics: Problems and Issues**, The University Press Ltd., Dhaka, 1980.

Jennings Sir Ivor, **Cabinet Government**, Cambridge University, Cambridge, 1961.

Kaul M. N. And Shakder, **S. L. Practice and Procedure of Parliament**, Fourth Edition, New Delhi, 1997.

Laver Michael and Shepsle, Kenneth A. (ed.), **Cabinet Ministers and Parliamentary Government**, Cambridge University Press, New York, 1994.

Dhaka University Institutional Repository

Laski Harold J., **A Grammer of Politics**, George Allen and Unwin Ltd., London, 1950.

Maniruzzaman Talukder, **Radical Politics and the Emergence of Bangladesh**, Bangladesh Books International, Dhaka, 1975.

----------, **The Politics of Development: The Case of Pakistan (1947-1958)**, Green Book House Ltd., Dhaka, 1971.

Maniruzzaman and Banu U.A.B. Razia Akter, "**Civilian Succession and 1981 Presidential Election in Bangladesh,**" in Peter Lyon and James Manor (eds.) **Transfer and Transformation Political Institution in Commonwealth**, Leicester, Leicester University Press, 1983, P-129.

Pyne Peter, "**Legislative and Development: The Case of Eduader, 1960-61,**" Comparative Political Studies, Vol. 9, No. 1, April 1976, P. 70.

Rashid Harun-or, **The Foreshadowing of Bangladesh**, Asiatic Society of Bangladesh, 1987.

Sen Rangalal, **Political Elites in Bangladesh**, University Press Limited, Dhaka, 1986.

Stewart Michael, **The British Approach to Politics**, London, 1967, PP-119-125.

Willoughby W. F., **Government of Modern States**, New York, 1936, PP-312-320.

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী দলিলপত্র
Public Documents

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ১৯৭২।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, ১৯৭৩-৭৫, ৭ খন্ড, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বিতর্ক, ১৯৭৩-৭৫, ৭ খন্ড, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, সরকারী প্রেস, ঢাকা ১৯৯৯, ১৯৯৬ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত সংশোধিত।

বাাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, গনপ্রজাতন্ত্রী, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি, ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৮০, ১৯৯৭, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, ১৯৯১-৯৫, ২২ খন্ড, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বুলেটিন, ১৯৯১-৯৫, ২২ খন্ড, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রশ্ন ও উত্তর, ১৯৯১-৯৫, ২২ খন্ড, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা।

Bangladesh, Government of the People's Republic of the Bangladesh Gazette Extra-ordinary, 1991-1995, Bangladesh Government Press, Dhaka.

----------, Bangladesh Election Commission, Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly, 1954. Bangladesh Government Press, 1977.

----------, Bangladesh Election Commission, Report on the First General Election to Parliament in

Dhaka University Institutional Repository

Bangladesh, 1973, Bangladesh Government Press, 1973.

----------, Bangladesh Election Commission, Report on the Fifth Parliamentary Election, 1991, Bangladesh Government Press, Dhaka, 1991.

Pakistan, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Manager of Publications, Karachi, 1956.

----------, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Manager of Publications, Karachi, 1962.

----------, Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Constitutional Documents, Vol. I, II, and III, Manager of Publications, 1964.

----------, Government of Election Commission, Report on General Elections Pakistan, 1970-71, Vol. 1, Manager of Publications, 1972.

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত প্রবন্ধ

Articles

Akanda S. A. — "**The National Language Issue Potent Force for Transforming East Pakistan Nationalism into Bengali Nationalism**," The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol. 1, No. 1, 1976.

----------, — "**The working of the Ayale Constitution and the People of Bangladesh**," The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol. 3, 1978.

Banu U.A.B. Razia Akter, — "**The Fall of Sheikh Muzib Regime An Analysis**," Indian Political Science Review, Vol. 15, No. 1, January 1981.

Jahan Rounaq — "**Bangladesh in 1972; Nation Building in a New State**," Asian Survey, Vol. XIII, No. 2, February 1973.

Maniruzzaman Talukder — "**Bangladesh in 1975: The Fall of the Mujib Regime and it Aftermath**" Asian Survey, Vol. XVI, No. 2, Febuary 1976.

Mohammad Anu, — **"Economics of the World Bank; Growing Resources, Increasing Deprivation,"** Holiday December, 1995.

Dhaka University Institutional Repository

----------, **"The Fall of the Military Dictator: 1991 Elections and the Prospect of Civilian Rule in Bangladesh,"** The Journal of Pacific Affairs, Vol. 65, No. 2, Summer 1992.

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র ও সাময়িকী

Newspapers and Periodicals

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৯১।
,, ০১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১।
,, ০৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১।
,, ১০ জুন, ১৯৯৪।
,, ২৫ মে, ১৯৯৪।
,, ১৯ জুলাই, ১৯৯৩।

দৈনিক সংবাদ, ১০ মে, ১৯৯৫।
,, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।
,, ০৪ এপ্রিল, ১৯৯৫।
,, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।
,, ০৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।
,, ০২ মার্চ, ১৯৯৪।
,, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

দৈনিক ইনকিলাব ২৫ এপ্রিল, ১৯৯৪।

দৈনিক জনকণ্ঠ ০৩ এপ্রিল, ১৯৯৫।
,, ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৬।
,, ২০ অক্টোবর, ১৯৯৫।

দৈনিক ভোরের কাগজ ২৪ নভেম্বর, ১৯৯৫।
,, ০৩ জুলাই, ১৯৯২।

দৈনিক আজকের কাগজ ২৯ জুলাই, ১৯৯৩।
,, ২৩ জুলাই, ১৯৯১।
,, ২০ মার্চ, ১৯৯৪।
,, ২১ মার্চ, ১৯৯৪।
,, ১৯ নভেম্বর, ১৯৯১।

দৈনিক জনতা ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক বাংলার বাণী ০৭ মে, ১৯৯৬।

বাংলা বাজার পত্রিকা ০২ মার্চ, ১৯৯৪।

দৈনিক খবরের কাগজ ১১ জুলাই, ১৯৯১।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা ৩০ আগস্ট, ১৯৯৫।
" ২৯ নভেম্বর, ১৯৯৫।

সাপ্তাহিক যায় যায় দিন ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।
" ১৪ জুলাই, ১৯৯৫।

সাপ্তাহিক রোববার ০৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

সাপ্তাহিক চিত্রবাংলা ০৫-১১ এপ্রিল, ১৯৯৬।

The New Nation 08 May, 1986.

The Bangladesh Observer

The Bangladesh Times

The Morning News.

The Weekly Holiday, 11 April, 1986.

Weekly Dhaka Courier, 24 November, 1995.

Far Eastern Economic Review, 31 December, 1992.